পুরাতনী

(পূজো নিয়ে পুরানো ও দুষ্প্রাপ্য রচনার সংকলন)

ভূমিকা

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা

নবকুমার ভট্টাচার্য্য

ও

বাসুদেব মোশেল

অভিনব প্রকাশনী

৭০/১, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৫

প্রথম প্রকাশ
শুভ-মহালয়া
১৩৫৯
বঙ্গাব্দ

প্রকাশক
নবকুমার ভট্টাচার্য্য

মুদ্রক
বি. এন. শীল
ইম্প্রেসন কনসালট্যান্ট
৩২ই, জয়মিত্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৫

প্রচ্ছদ
সত্য চক্রবর্ত্তী

প্রাপ্তিস্থান :
পুস্তক বিপনি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

ভূমিকা

দনুজমর্দনদেব, না কংসনারায়ণ—কে যে দশভুজা দুর্গাপূজার প্রচলন করেছিলেন তা আজ ইতিহাসের বিষয়। পুরাতন পৌরাণিক সাহিত্যে পুত্রকন্যাসহ দুর্গাপূজার উল্লেখ পাওয়া যায় না। চতুর্ভুজা বা অষ্টভুজা চণ্ডী মূর্তিরই বেশী জনপ্রিয়তা ছিল। কিন্তু বাংলাদেশে শরৎকালে দশভুজাপূজার আয়োজন প্রায় পাঁচশ বছর ধরে চলে আসছে। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে শরৎকালে যখন শস্য পেকে ওঠে, তখন চারিদিকে যে প্রসন্নতার পরিবেশ রচিত হয়, তারই প্রকাশ ঘটে এই পূজানুষ্ঠানে। তবে কি কৃষিসভ্যতার সঙ্গে দুর্গাপূজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে? পণ্ডিতেরা তাই নিয়ে তর্ক করুন। কিন্তু শরতে যখন আকাশ নির্মেঘ নীল, বাতাসে মোহার রৌদ্র, মাটিতে পক্বশ্যাম শস্যরাশি, তখনই তো আগমনীর গান ধ্বনিত হয়। দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দুর প্রধানতম সামাজিক উৎসব, যদিও ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে ঘিরেই অনন্ত ক্রিয়াকর্ম।

একসময়ে দুর্গাপূজা প্রাক্কালে ভিখারীরা আগমনী গান গাইত, গ্রামে গ্রামে পূজাবাড়ীতে পসারীরা পসরা সাজিয়ে বসত। ছাপাখানার যুগে রামপ্রসাদী আগমনী গানের ছোট ছোট সঙ্কলন বাজারে দু' এক পয়সায় বিক্রয় হত। একালে তার পরিবর্তে প্রকাশিত হয় বিশাল মাপের পূজাসংখ্যা। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক,—সব পত্র-পত্রিকারই শারদীয়া সংখ্যা বাজার ছেয়ে ফেলে। এ-সব শুধু এই শতাব্দীরই ব্যাপার নয়, উনিশ শতকেও একাধিক পূজাসাহিত্য প্রকাশিত হত। পূজা উপলক্ষে কত রকমের গান বাঁধা হত, কত রংতামাসায় পূর্ণ পদ্য ও ছড়া ফাঁদা হত। কখনো কখনো গদ্য নক্শা, গালগল্প, জানা অজানা কথা ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করত। বাসুদেব মোশেল এই পুস্তিকায় শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রকাশিত সেকালের কিছু কিছু স্কেচ্ গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় হুতোমের স্কেচ। উনিশ শতকের কলকাতাই দুর্গাপূজার এমন জীবন্ত বর্ণনা একালেও পাওয়া যাবে না। সেকালের বারোয়ারি একালে

সাধুভাষায় সার্বজনীন (সর্বজনীন) পূজায় উত্তীর্ণ হলেও দু' যুগের মানসিকতার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। সেকালের দুর্গাপূজা-সংক্রান্ত কিছু কিছু সংবাদ এই গত্যস্কেচ্ ও রংতামাসার ছড়া থেকে পাওয়া যাবে। এ-গুলির দু' একটি রচনা একালের জিজ্ঞাসু পাঠকের জানা থাকলেও এর অধিকাংশই প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে বলে নবীন যুগ এ-সব সস্তা সাংবাদিকতা ছেড়ে দিয়ে একালের মানসিকতা অবলম্বন করেছে। কিন্তু এই সমস্ত রচনা এখনও আমাদের কাছে স্পৃহনীয়, কারণ এর মধ্য দিয়ে আমরা পুরাতন কলকাতার সদাসন্তুষ্ট প্রসঙ্গ জীবনের ছবিই পাই। রঙ্গ, কৌতুক, কিঞ্চিৎ ভাঁড়ামি—এই সব নিয়ে এর ষোলআনা আয়োজন। তাই এগুলি এখনো আকর্ষক মনে হয়। আজকের দিনে অহোরাত্র আমরা নানা সমস্যায় জড়িত, নানা অভাব-অভিযোগে বিভ্রান্ত। রাজনীতির অশুভ প্রভাবে বাঙালি চেতনার মূল্যমান দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আগামী দশ বছরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ চরিত্রভ্রষ্ট পশুধর্মী অমানুষ মানুষে ভরে যাবে। তখন প্রয়োজন হবে মহিষমর্দ্দিনী দশভুজার। তখন হয়তো তাঁকে নরদেহধারী বহু ছাগমুণ্ড খড়্গাঘাতে ছিন্ন করতে হবে। সে এক দুঃসহ ট্র্যাজেডি, যা জাতির শিরে ডিমোক্লিসের খড়্গের মতো আন্দোলিত হচ্ছে। যাক, মহাপূজার আনন্দ মিলনকক্ষে এ-সমস্ত তিক্ত প্রসঙ্গের কথা আপাতত তোলা থাক।

এই পুস্তিকাটি শুধু রঙ্গরহস্যের সঙ্কলন নয়, এর সঙ্গে গতকালের কলকাতার জীবন জড়িয়ে আছে। তা আধুনিক প্রগতিশীল জীবনের মতো উত্তাল কলরোলে উচ্চকিত নয়, সমস্যাজড়িত বাঙালির আশাহীন আনন্দহীন বিষণ্ণ মুহূর্তের খতিয়ানও নয়। তাতে আছে জীবনের রস ও রং। একালের পাঠক-পাঠিকা এর থেকে সেকালের কলকাতাকে চিনে নিতে পারবেন। এখানেই সঙ্কলনটির সার্থকতা। যিনি এটি সঙ্কলন করেছেন তাঁর বিবক্ষণতার প্রশংসা করি।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

পুরাতনী

বাঙালীর সেরা পুজো দুর্গা পুজো। দুর্গাপুজায় বাঙালীর আহ্লাদ-আমোদের শেষ থাকে না। সেইসঙ্গে আয়োজনেরও। দুর্গা পুজোর বিপুল আয়োজন শুধু একালেই নয়—। সেকালেও পুজোয় কতরকমের ধুম ধাম। নাচ-গান, খানা পিনা, দান খয়রাত, আমোদ-প্রমোদ তো ছিলই। ছিল কেনা-কাটারও। পুজোর মরশুম মানে তো কেনা-কাটার মরশুম। সাজ-সজ্জার মরশুম। এমন মরশুমে হাটে-বাজারের চেহারাটাই যেন অন্য রকমের। কতরকম পণ্য সামগ্রীর সঙ্গে একালে যেমন পুজো সংখ্যাগুলি রঙে রূপে, রেখায় লেখায় জম-জমাটি সাজে পাল্লা দিয়ে বাজার ছেয়ে ফেলে। সেকালে এমনটি ছিল না। হয়তো সেকালে পুজো সংখ্যা প্রকাশের কোন রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু পুজোর সময় পুজো নিয়ে লেখা-লেখি খুব একটা কম হোত না। তবে নানাধরনের পত্র পত্রিকা, পুস্তক পুস্তিকায় পুজো নিয়ে আগমনী, গাল গল্প, নকশা ও রঙ তামাসা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতো পুজোর মরশুমেই। যা সেকালের বাঙালী পাঠককে মুগ্ধ করতে যথেষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল। সত্যিই সেকালের লেখাগুলির বর্ণনাও ব্যঞ্জনা গুণও গুরুত্ব বিচারে দুর্বল ছিল না। একাল অপেক্ষা সেকালের রচনাগুলির প্রকাশভঙ্গি যা ভিন্ন ছিল। সেকালের পুজোয় কি ধরনের লেখা

পাঠককে আকর্ষণ করত তা একালের পাঠকের কাছে অজ্ঞাত। সেই অজ্ঞাত রচনাবলীর ভেতরে যেমন সমকালীন বাঙালীর ভাবনা-চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে, তেমনি দুর্গোৎসবকে ঘিরে বাঙালী জীবনের উন্মাদনার কৌতুহলোদ্দীপক চিত্রও ফুটে উঠেছে। বলাই বাহুল্য সেইসব পুরানো দিনের হারানো লেখাগুলির—ঐতিহাসিক ও সামাজিক দিক গুলির কথা ভেবেই বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ গ্রহণের উদ্দেশ্য নিয়েই···নতুন ভাবেই 'পুরাতনীর' প্রকাশ। যা একালের পাঠকের কাছে, 'পুরাতনী' সমান আকর্ষনীয় ও উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে। সেই সদ্ ইচ্ছা ও চেষ্টাতেই 'পুরাতনী'র আত্মপ্রকাশ। 'পুরাতনী' পাঠে একালের পাঠকেরা তৃপ্তি পেলে···সেকালের লেখকরাও যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে। এমন ভেবে-চিন্তেই 'পুরাতনী'র লেখাগুলি নির্বাচিত হয়েছে। পুজোর আনন্দেই নয়, চিরকালের আনন্দরস উপভোগ করুন 'পুরাতনী' পাঠে। এটাই আমাদের কামনা। এবং আমাদের প্রচেষ্টাও পরিশ্রম সার্থক হয়ে উঠুক 'পুরাতনী'র প্রচারে।

বিনীত

বাসুদেব মোশেল

নবকুমার ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

বটতলার পঞ্জিকায় দুর্গা মূর্ত্তি

নানাতন্ত্রমতং দেবি নানাযন্ত্রং প্রকাশিতম্।
ব্রহ্মস্বরূপং বিজ্ঞাতুং কঃ সমর্থো মহীতলে॥
নানামার্গে প্রধাবন্তি পশবো হতবুদ্ধয়ঃ।
শ্রীদুর্গাচরণাম্ভোজং হিত্বা যান্তিরসাতলম্॥

চিত্র পরিচয়

বঙ্গের দুর্গোৎসব   পৃষ্ঠা নং ৬৯

লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্ত্তিক কেউ নেই, এমনকি জগন্মাতা ভগবতীও নেই—। আছে কেবল চালচিত্রখানি অর্থাৎ কেবল কাঠামোখানি। সেই কাঠামোয় দাঁড়িয়ে আছেন মহিষমর্দিনী রূপিনী শিক্ষিতা স্ত্রী প্রাণপতি দমনে যথার্থ স্থান অধিকার করেছেন। স্বামী বেচারা নিরুপায়। বিষম বিপদ বুঝে তিনি দেবী রূপিনী স্ত্রীর স্তব আরম্ভ করেছেন॥

(জন্মভূমি, আশ্বিন ১২৯৮)

দুর্গোৎসব   পৃষ্ঠা নং ৮৭

সেকালে দুর্গোৎসবের বিচিত্র চালচিত্রটি ধরা পড়েছে ছবিটির মধ্যে। উনবিংশ শতাব্দীর দুর্গোৎসবে এমন চিত্র বিরল ছিল না।

মেড়া অবতার   পৃষ্ঠা 'ঙ'

সেকালের কলকাতায় দুর্গাপূজায় ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ীতে আমোদ প্রমোদের সীমা ছিল না। সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে বেলেল্লাপনারও কোন শেষ ছিল না। চিত্রে পুজো বাড়াতে বেলেল্লাগিরির মধ্যে কর্তাকে 'মেড়া অবতার' হিসাবে সাজানো হয়েছে।

(অনুসন্ধান ভাদ্র ২৯৭)
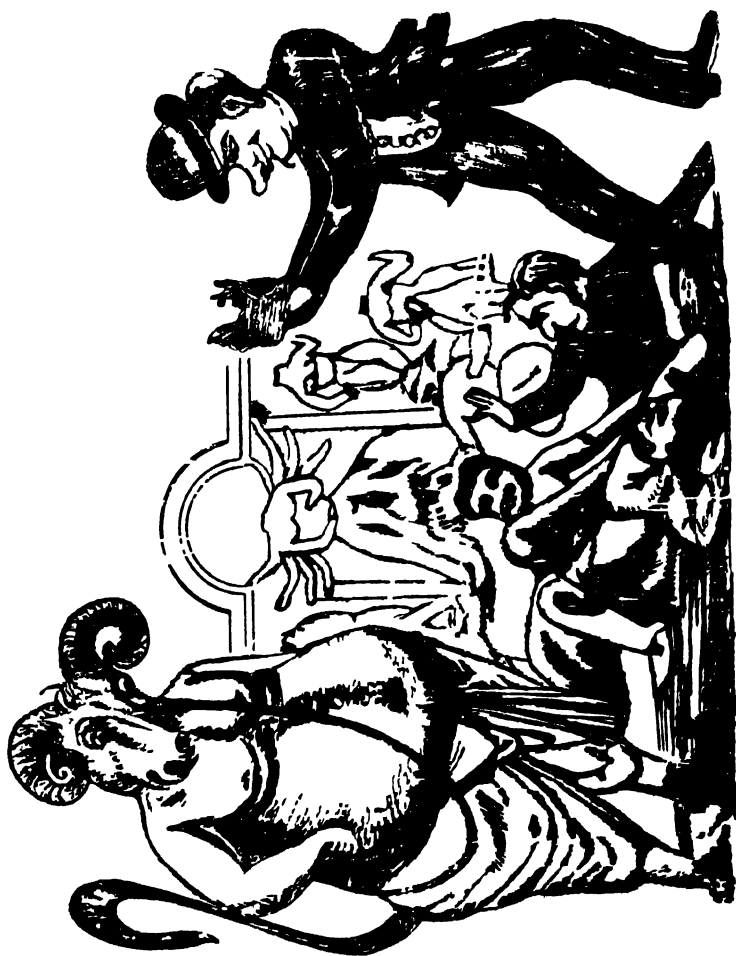
(ঘ)

আগমনী কেন আর ?

পাষানি, পাষান-সুতা !
চাহি না মা তোরে আর।
ফিরে যা এবার উমা,
হৃদয় যে অন্ধকার।
কাঁদিতে জনম গেল,
না মুছিল অশ্রুজল,
অবিরাম শোক-শেল,
বাজে বুকে অভাগার ॥
অন্নবিনা হাহাকার,
প'ড়েছে মা চারিধার,
তুমি মা অন্নপূর্ণে,
করিলে কি প্রতিকার ;
যায় বিশ্ব রসাতল,
মরে জীব অবিরল,
শুন দুঃখ কোলাহল,
'আগমনী' কেন আর ॥

৩০ আশ্বিন ১২৯৮ সাল-এর 'অনুসন্ধান' পত্রিকা হইতে সংগৃহীত।

দুর্গোৎসব

হুতোম প্যাঁচা

দুর্গোৎসব বাঙ্গালা দেশের পরব, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এর নামগন্ধও নাই ; বোধ হয়, রাজা কৃষ্ণচন্দরের আমল হতেই বাঙ্গালায় দুর্গোৎসবের প্রাদুর্ভাব বাড়ে পূর্ব্বে রাজারাজড়া ও বনেদী বড় মানুষদের বাড়ীতেই কেবল দুর্গোৎসব হতো, কিন্তু আজকাল পুঁটে তেলীকেও প্রতিমা আনতে দ্যাখা যায় ; পূর্ব্বকার দুর্গোৎসব ও এখনকার দুর্গোৎসবে অনেক ভিন্ন।

ক্রমে দুর্গোৎসবের দিন সংক্ষেপ হয়ে পড়লো ; কৃষ্ণনগরের কারিকরেরা কুমারটুলী ও সিদ্ধেশ্বরীতলা জুড়ে বসে গ্যালো, জায়গায় জায়গায় রংকরা পাটের চুল, তবলকার মালা, টিন ও পেতলের অসুরের ঢাল তলওয়ার, নানারঙের ছোবান প্রোতমের কাপড় ঝুলতে লাগলো, দর্জ্জীরা ছেলেদের টুপি, চাপকান ও পেটী নিয়ে দরোজায় দরোজায় বেড়াচ্চে ; "মধু চাই !" "শাঁখা নেবে গো !" বলে ফিরিওয়ালারা ডেকে ডেকে ঘুচ্চে। ঢাকাই ও শান্তিপুরে কাপুড়ে মহাজন, আতরওয়ালা ও যাত্রার দালালেরা আহার নিদ্রে পরিত্যাগ করেছে। কোনখানে কাঁসারীর দোকানে রাশীকৃত মধুপর্কের বাটি ও চুমকি ঘটি ও পেতলের থালা ওজন

হচ্চে। ধূপ ধুনো, বেণে মসলা ও মাথাঘষার একুট্টা দোকান বসে গ্যাচে। কাপরের মহাজনেরা দোকানে ডবল পর্দ্দা ফেলেচে. দোকান ঘর অন্ধকার প্রায়। তারি ভেতরে বসে যথার্থ পাই লাভে বউনি হচ্চে।

সিঁদুর চুপড়ি, মোমবাতি, পিঁড়ে ও কুশাসনেরা অবসর বুঝে দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে আ্যাকুড়ক্টের উপর বার দিয়ে বসেচে। বাঙ্গাল ও পাড়াগেঁয়ে চাকরেরা আরসি, ঘুনসি, গিলটির গহনা ও বিলিতি মুক্তা একচেটিয়ে কিনচেন. রবরের জুতো, চমফরটর, ষ্টিক ও ক্যাম্বিসওয়ালা পাগড়ি অগুন্তি উঠচে। ঐ সঙ্গে বেলোয়ারি চুড়ি, আঙ্গিয়া. বিলিতী সোনার শীল আংটি চুলের গার্ডচেনের ও অসঙ্গত খদ্দের। এক দিন জুতোর দোকান ধুলো ও মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু পূজোর মোরশুমে বিয়ের কনের মত ফেঁপে উঠেচে; দোকানের কপাটে কাই দিয়ে নানারকম রঙ্গীন কাগজ মারা হয়েছে, ভেতরে চেয়ার পাতা, তার নীচে এক টুকরো ছেঁড়া কারপেট। সহরের সকল দোকানেরই শীতকালের কাগের মতো চেহারা ফিরেচে। যত দিন ঘনিয়ে আসচে, ততই বাজারের কেনা ব্যাচা বাড়ছে, ততই কলকেতা গরম হয়ে উঠচে। পল্লী গ্রামের টুলো অধ্যাপকেরা বৃত্তি ও বার্ষিক সাদতে বেরিয়েচেন, রাস্তায় রাস্তায় রকম রকম তরবেতর চেহারার ভিড় লেগে গ্যাচে।

কোনখানে খুন; কোনখানে দাঙ্গা, কোথায় সিঁদচুরি, কোনখানে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছ থেকে তু ভরি রূপা গাঁটকাটায় কেটে নিয়েচে; কোথাও মাগীর নাকে থেকে নথটা ছিঁড়ে নিয়েচে;

পাহারাওয়ালারা শশব্যস্ত, পুলিশ বদমাইস পোরা, চোরেরা পূজোর মোরশুমে দেদার কারবার ফালাও কচ্চে, "লাগে তাক্ না লাগে তুক্কো" "কিনি তো হাতি, লুটি ত ভাণ্ডার" তাদের জপমন্ত্র হয়েচে; অনেকে পার্ব্বণের পূর্ব্বে শ্রীঘরে ও বাস্কুলে বসতি কচ্চে; কারো পূজোয় পাথরে পাঁচ কিল; কারো সর্ব্বনাশ, ক্রমে চতুর্থী এসে পড়লো।

এবার অমুক বাবুর নতুন বাড়িতে পূজার ভারি ধূম। প্রতি প্রদাদি কল্পের পর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় আরম্ভ হয়েচে। আজও চোকে নাই—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ি গিস্‌গিস্ কচ্চে। বাবু দেড় ফিট উচ্চ গদির উপর তসর কাপড় পরে বার দিয়ে বসেচেন, দক্ষিণে দেওয়ান টাকা ও সিকি আধুলির তোড়া নিয়ে খাতা খুলে বসেচেন, বামে হরীশ্বর ন্যায়ালঙ্কার সভাপণ্ডিত, অনবরত নস্য নিচ্চেন ও নাসানিঃসৃত রঙ্গীন কফজল জাজিমে পুচ্চেন। এদিকে জহুরা জড়োয়া গহনার পুঁটুলি ও ঢাকাই মহাজন ঢাকাই শাড়ীর গাঁট নিয়ে বসেচে, মুন্সি মশাই, জামাই ও ভাগ্নে বাবুরা ফর্দ্দ কচ্চেন। সামনে কতকগুলি প্রিতিমে ফ্যালা দুর্গাদায় গ্রস্ত ব্রাহ্মণ, বাইরের দালাল, যাত্রার অধিকারী ও গাইয়ে ভিক্ষুক "যে আজ্ঞা" "ধর্ম্ম অবতার" প্রভৃতি প্রিয়বাক্যের উপহার দিচ্চেন। বাবু মধ্যে মধ্যে কারেও এক আধটা আগমনী গাইবার ফরমাস কচ্চেন। কেও খোসগল্প ও অন্য বড় মানুষের নিন্দাবাদ করে বাবুর মনোরঞ্জনের উপক্রমণিকা কচ্চেন।—আসল মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে রয়েচে, উপযুক্ত সময়ে তীরস্থ হবে। আতরওয়ালা, তামাকওয়ালা দানা-ওয়ালা ও অন্যান্য পাওনাদার মহাজনরা বাইরে বারাণ্ডায় ঘুচ্চে—

পুজো যার তথাচ তাদের হিসেব নিকেশ হচ্চে না।

সভাপণ্ডিত মহাশয় মরপেটে পিরিলীর বাড়ির বিদায় নেওয়া ও বিধবাদলের এবং বিপক্ষ পক্ষের ব্রাহ্মণদের নাম কাটচেন: অনেকে তাঁর পা ছুঁয়ে দিব্বি গালচেন যে, তাঁরা পিরিলীর বাড়ি চেনেন না; বিধবা বিয়ের সভায় যাওয়া চুলোয় যাক, গত বৎসর শয্যাগত ছিলেন বল্লেই হয়। কিন্তু বানের মুখে জেলে ডিঙ্গীর মত তাঁদের কথা তল্ হয়ে যাচ্চে। নাম কাটাদের পরিবর্ত্তে সভাপণ্ডিত আপনার জামাই, ভাগ্নে, নাতজামাই, দৌত্তুর ও খুড়তুতো ভায়েদের নাম হাঁসিল কচ্চেন; এদিকে নামকাটারা বাবু ও সভাপণ্ডিতকে বাপান্ত করে পৈতে ছিঁড়ে গালে চড়িয়ে শাঁপ দিয়ে উঠে যাচ্ছেন। অনেক উমেদারের অনিয়ত হাজরের পর বাবু কাকেও "আজ যাও" "কাল এসো" "হবে না" "এবার এই হলো" প্রভৃতি অনুজ্ঞায় আপ্যায়িত কচ্চেন—হজুরী সরকারের হেকমত ছ্যাখে কে! সকলেই শশবাস্ত, পূজার ভারি ধুম।

ক্রমে চতুর্থীর অবসান হলো, পঞ্চমী প্রভাত হলেন—ময়রারা ছুর্গোমোণ্ডা ও আগাতোলা সন্দেশের ওজন দিতে আরম্ভ কল্লে। পাঁঠার রেজিমেন্টকে রেজিমেন্ট বাজারে প্যারেড্ কত্তে লাগ্‌লো, গন্ধবেণেরা মসলা ও মাথা ঘষা বেঁধে বেঁধে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। আজ সহরের বড় রাস্তায় চলা ভার; মুটেরা প্রিমিয়মে মোট বইচে, দোকানে খদ্দের বসবার স্থান নাই। পঞ্চমী এইরূপে কেটে গ্যালো। আজ ষষ্ঠী, বাজারের শেষ কেনাবেচা, মহাজনের শেষ তাগাদা, আশার শেষ ভরসা। আজ আমাদের বাবুর বাড়ির ও অপূর্ব্ব শোভা: সব চাকর বাকর নতূন তকমা। উদ্দি ও কাপড়

পরে ঘুরে বেড়াচ্চে ; দরজার দুই দিকে পূর্ণকুম্ভ ও আম্রসার দেওয়া হয়েছে। ঢুলীরা মধ্যে মধ্যে রোশনচৌকি ও শানাইয়ের সঙ্গে বাজাচ্চে, জামাই ও ভাগ্নেবাবুরা নতুন জুতো নতুন কাপড় পরে ফররা দিচ্চেন বাড়ির কোন বৈঠকখানায় আগমনী গাওয়া হচ্চে, কোথাও নতুন তাসজোরা পরকান হচ্চে, সমবয়সী ও ভিক্ষুকের ম্যালা লেগেচে, আতরের উমেদারেরা বাবুদের কাছে শিশি হাতে করে সাতদিন ঘুচ্চে। কিন্তু বাবুদের এমান অনবকাশ যে দু ফোঁটা আতর দানের অবসর হচ্চে না।

এদিকে সহরের বাজারের মোড়ে ও চৌরাস্তায় ঢুলী ও বাজন্দারের ভিড়ে সেঁদোনা ভার রাজপথ লোকারণ্য ; মালীরা পথের ধারে পদ্ম চাঁদ মালা, বিল্লপত্র ও কুচো ফুলের দোকান সাজিয়ে বসেচে ; দইয়ের ভার, মণ্ডার থুলী ও লুচি কচুরীর ঝড়ায় রাস্তা জুড়ে গেছে ; রেও ভাট ও আমাদের মত মলারেরা মিমো করে নিচ্চে—কোথায় যায় ?

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় সহরে প্রতিমার অধিবাস হয়ে গ্যালো কিছুক্ষণ ঢোল ঢাকের শব্দ থামলো। পুজো বাড়িতে ক্রমে “আন্ রে” “কর রে” “এটা কি হলো” কত্তে কত্তে ষষ্ঠীর শর্ব্বরী অবসন্না হলো, সুখতারা মৃদু পবন আশ্রয় করে উদয় হলেন। পাখিরা প্রভাত প্রত্যক্ষ করে ক্রমে ক্রমে বাসা পরিত্যাগ কত্তে আরম্ভ কল্লে, সেই সঙ্গে সহরের চারি দিকে বাজনা বাদ্দি বেজে উঠ্লো, নব পত্রিকার স্নানের জন্য কর্ম্মকর্ত্তারা শশব্যস্ত হলেন—ভাবুকের ভাবনায় বোধ হতে লাগ্লো, যেন সপ্তমী কোর্ মাথান নতুন কাপড় পরিধান করে হাসতে হাসতে উপস্থিত হলেন।

এদিকে সহরের সকল কলাবউয়েরা বাজনা বাদ্দি করে স্নান করতে বেরুলেন, বাড়ির ছেলেরা কাঁসর ও ঘড়ি বাজাতে বাজাতে সঙ্গে সঙ্গে চল্লো—এদিকে বাবুর কলাবউয়ের ও স্নানের সরঞ্জাম বেরুলো। আগে আগে কাড়ানাগড়া, ঢোল ও সানাইদারেরা বাজাতে বাজাতে চল্লো। তার পেছনে নতুন কাপড় পরে আশাসোঁটা হাতে বাড়ির দরওয়ানেরা। তার পশ্চাৎ কলাবউ কোলে পুরোহিত, পুঁথি হাতে তন্ত্রধারক। বাড়ির আচার্য্য বামুন, গুরু ও সভাপণ্ডিত, তার পশ্চাৎ বাবু, বাবুর মস্তকে লাল মাটিলের রূপোর রামছাতা ধরেছে। আশে পাশে ভাগ্নে, ভাইপো ও জামাইয়েরা। পশ্চাৎ আমলা ফয়লা ও ঘরজামাইয়ে ভগিনীপতিরা, মোসায়েব ও বাজে দল, তার শেষে নৈবিদ্দ, লণ্ঠন ও পুষ্পপাত্র, শাঁখ ঘণ্টা ও কুশাসন প্রভৃতি পূজার সরঞ্জাম মাথায় মালীরা। এই প্রকার সরঞ্জামে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবুর ঘাটে কলাবউ নাওয়াতে চল্লেন, ক্রমে ঘাটে পৌছুলে কলা বউয়ের পূজো ও স্নানের অবকাশে হজুরও গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করে নিয়ে স্তব পাঠ কত্তে কত্তে অনুরূপ বাজনা বাদ্দির সঙ্গে বাড়ি মুখো হলেন।

পাঠকবর্গ! এ সহরে আজকাল দুচার এজুকেটেড ইয়ং-বেঙ্গল ও পৌত্তলিকতার দাস হয়ে পূজো আচ্ছা করে থাকেন—ব্রাহ্মণ ভোজনের বদলে কতকগুলি দিলদোস্ত মদে ভাতে প্রসাদ পান, আলাপী ফিমেল ফ্রেণ্ডেরাও নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন, পূজোরো কিছু রিফাইণ্ড কেতা। কারণ অপর হিন্দুদের বাড়ি নিমন্ত্রিত প্রদত্ত প্রণামী টাকা পুরোহিত ব্রাহ্মণেরই প্রাপ্য। কিন্তু এঁদের বাড়ি প্রণামীর টাকা বাবুর অ্যাকাউণ্টে ব্যাঙ্কে জমা হয়, প্রতিমের

সাম্‌নে বিলিতী চর্ব্বির বাতি জ্বলে ও পূজোর দালানে জুতো নিয়ে ওঠবার অ্যালাওয়েন্স থাকে। বিলেত থেকে অর্ডর দিয়ে সাজ আনিয়ে প্রতিমে সাজান হয়—মা দুর্গা মুকুটের পরিবর্ত্তে বনেট্ পরেন। স্যাণ্ডউইচের শেতল খান, আর কলাবউ গঙ্গাজলের পরিবর্ত্তে কাংলোকরা গরম জলে স্নান করে থাকেন। শেষে সেই প্রসাদী গরম জলে কর্ম্মকর্ত্তার প্রাতরাশের টী ও কফি প্রস্তুত হয়।

ক্রমে তাবৎ কলাবউয়েরা স্নান করে ঘরে ঢুকলেন। এদিকে পূজাও আরম্ভ হলো, চণ্ডীমণ্ডপে বারকোসের উপর আগাতোলা মোণ্ডাওয়ালা নৈবিদ্দি সাজান হলো, সঙ্গতি বুঝে চেলীর শাড়ী, চিনির থাল, ঘড়া, চুমকি, ঘটি ও সোনার লোহা; নয়ত কোথাও সন্দেশের পরিবর্ত্তে গুড় ও মধুপর্কের বাটির বদলে খুরি ব্যবস্থা। ক্রমে পূজা শেষ হলো; ভক্তরা এতক্ষণ অনাহারে থেকে পূজোর শেষে প্রতিমারে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন, বাড়ির গিন্নারা চণ্ডী শুনে জল খেতে গ্যালেন: কারো বা নবরাত্তির। আমাদের বাবুর বাড়ির পূজোও শেষ হলো প্রায়, বালদানের উদ্‌যোগ হচ্চে; বাবু মায় ষ্টাফ আদুড় গায়ে উঠানে দাঁড়িয়েচেন, কামার কোমর বেঁধে প্রতিমের কাছ থেকে পূজো ও প্রতিষ্ঠা করা খাঁড়া নিয়ে কাণে আর্শীর্ব্বাদী ফুল গুঁজে হাড়কাঠের কাছে উপস্থিত হলো, পাশ থেকে একজন মোসাহেব "খুটি ছাড়! খুটি ছাড়!" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে পাঁঠাকে হাড়কাঠে পুরে দিয়ে খিল এঁটে দেওয়া হলো। একজন পাঁঠার মুড়ি ও আর একজন ধড়টা টেনে ধল্লে—অমনি কামার "জয় মা!! মা গো!" বলে কোপ তুল্লে, বাবুরাও সেই সঙ্গে "জয় মা!! মা গো!" বল্লে

প্রতিমের দিকে ফিরে চেঁচাতে লাগলেন—ছপ্ করে কোপ পড়ে গ্যালো—গীজা গীজা গীজা গীজা, নাক্ টুপ্ টুপ্ টুপ্ শব্দে ঢোল, কাড়ানাগরা ও ট্যাম্‌টমি বেজে উঠ্‌লো; কামার সরাতে সমাংস করে দিলে পাঁঠার মুড়ির মুখ চেপে ধরে দালানে পাঠানো হলো। এদিকে একজন মোসাহেব সন্তর্পণে খর্পরের মরা আচ্ছাদন করে প্রতিমের সম্মুখে উপস্থিত কল্লে বাবুরা বাজনার ঢঙের মধ্যে হাততালি দিতে দিতে ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপে উঠলেন—প্রতিমার সাম্‌নে দানের সামগ্রী ও প্রদীপ জেলে দেওয়া হলে আরতি আরম্ভ হলো। বাবু সহস্তে ধবল গঙ্গাজল চামর বীজন কত্তে লাগলেন, ধূপ ধুনোর ধোঁয়ে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গ্যালো, এইরূপে আধ ঘণ্টা আরতির পর শাঁখ বেজে উঠলো, সবাবু সকলে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করে বৈঠকখানায় গ্যালেন। এদিকে দালানে বামুনেরা নৈবিদ্দ নিয়ে কাড়াকাড়ি কত্তে লাগলো। দেখতে দেখতে সপ্তমীও ফুরালো।

ক্রমে নৈবিদ্দ বিলি, কাঙ্গালী বিদায় ও জলপান বিলানোতেই সেদিনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গ্যালো, বৈকালে চণ্ডীর গানওয়ালারা খানিকক্ষণ আসর জাগিয়ে বিদায় হলো—জগা স্যাক্‌রা চণ্ডীর গানের প্রকৃত ওস্তাদ ছিল, সে মরে যাওয়াতেই আর চণ্ডীর গানের প্রকৃত গায়ক নাই; বিশেষত এক্ষণে শ্রোতাও অতি-দুর্লভ হয়েচে।

ক্রমে ছটা বাজলো, দালানের গ্যাসের ঝাড় জেলে দিয়ে প্রতিমার আরতি, আরম্ভ করে দেওয়া হলো এবং মা দুর্গার শেতলের জলপান ও অন্যান্য সরঞ্জাম ও সেই সময় দালানে সাজিয়ে

দেওয়া হলো—মা দুর্গা যত খান বা না খান, লোকে দেখে প্রশংসা কল্লেই বাবুর দশটাকা খরচের সার্থকতা হবে। এদিকে সন্ধ্যার সঙ্গে দর্শকের ভিড় বাড়তে লাগলো; বাঙ্গাল দোকানদার, ঘুস্কা ও খানকীরা ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও আদ্বয়সা ছোড়া সঙ্গে খাভায় খাতায় প্রতিমে দেখতে আসতে লাগলো। এদিকে নিমন্ত্রিতেরা সেজেগুজে এসে টনাৎ করে একটা টাকা ফেলে দিয়ে প্রণাম কল্লে, অমনি পুরুত একছড়া ফুলের মালা নেমন্তন্নের গলায় দিয়ে টাকাটা কুড়িয়ে ট্যাকে গুঁজলেন, নেমন্তন্নে ও হন্ হন্ করে চলে গেলেন। কলকেতা সহরের এই একটি বড় আজগুব কেতা, অনেক স্থলে নিমন্ত্রিতেরাও কর্ম্মকর্ত্তায় চোরে কামারের মত সাক্ষাৎও হয় না, কোথাও পুরোহিত বলে গ্যান "বাবুরা ওপরে, ঐ সিঁড়ি মশাই যান না।" কিন্তু নিমন্ত্রিত যেন চিরপ্রচলিত রীতি অনুসারেই "আজ্ঞে না, আরো পাঁচ জায়গায় যেতে হবে। থাক্" বলে টাকাটি দিয়েই অমনি গাড়িতে ওঠেন; কোথাও যদি কর্ম্মকর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তবে গিরগিটের মত উভয়ে একবার ঘাড় নাড়ানাড়ি মাত্র হয়ে থাকে—সন্দেশ মেঠাই চুলোয় যাক্, পান তামাক মাথায় থাক্, প্রায় সর্ব্বত্রই সাদর সম্ভাষণেরও বিলক্ষণ অপ্রতুল—দুই এক জায়গায় কর্ম্মকর্ত্তা জরির মছলন্দ পেতে, সামনে আতর দান, গোলাপপাস সাজিয়ে পয়সার দোকানের পোদ্দারের মত বসে থাকেন। কোন বাড়ির বৈঠকখানায় চোহেলের রৈ রৈ ও হৈচৈয়ের তুফানে নেমন্তন্নের সেঁধুতে ভরসা হয় না—পাছে কর্ম্মকর্ত্তা তেড়ে কামড়ান। কোথায় দরজা বন্ধ, বৈঠকখানা অন্ধকার হয় ত বাবু ঘুমুচ্চেন, নয় বেরিয়ে গ্যাচেন, দালানে জনমানব নাই। নেমতন্নে

কার সমুখে যে প্রণামা টাকাটি ফেল্‌বেন ও কি করবেন, তা ভেবে স্থির কত্তে পারেন না, কর্ম্মকর্ত্তার ব্যাভার দেখে প্রাণেমে পর্য্যন্ত অপ্রস্তুত হন। অথচ এরকম নিমন্ত্রণ না কল্লেই নয়। এই দরুন অনেক ভদ্রলোক আজকাল আর "সামাজিক" নেমন্তন্নে স্বয়ং যান না, ভাগ্যে বা ছেলেপুলের দ্বারাতেই ক্রিয়েবাড়ির পুরুতের প্রাপ্য কিম্বা বাবুদের ওংকরা টাকাটি পাঠিয়ে দ্যান কিন্তু আমাদের ছেলে-পুলে না থাকায় ও স্বয়ং গমনে অসমর্থ হওয়ায় স্থির করেছি, এবার অবধি প্রণামার টাকায় পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প কিনে ডাকে পাঠিয়ে দেবো, তেমন তেমন আত্মীয়স্থলে (সেফ এ্যারাংজ্যালের জন্য) রেজিষ্টরী করে পাঠান যাবে ; যে প্রকারে হোক্ টাকাটি পৌছনো নে বিষয়। অধ্যাপক ভায়ারা এ বিষয়ে অনেক সুবিধে করে দিয়েচেন, পুজো ফুরিয়ে গেলে তাঁরা প্রণামীর টাকাটি আদায় কত্তে স্বয়ং ক্লেশ নিয়ে থাকেন, নেমন্তন্নের পূর্ব্ব হতে পুজোর শেষে তাঁদের আত্মীয়তা আরও বৃদ্ধি হয়। অনেকের প্রণামা চাইতে আসাই পুজোর প্রুফ্।

মনে করুন, আমাদের বাবু বনেদী বড় মানুষ ; চাইন স্বতন্ত্র আরাতির পর বানারসী জোড় পরে সভাসদ্ সঙ্গে নিয়ে দালানে বার দিলেন, অমনি তক্‌মা পরা বাঁকা দরওয়ানেরা তলওয়ার খুলে পাহারা দিতে লাগ্‌লো ; হরকরা হুকোবর্‌দার, বিবির বাড়ির বেহারাও মোসাহেবরা জোড় হস্ত হয়ে দাঁড়ালো কখন কি ফরমাস হয়। বাবুর সাম্‌নে একটা সোনার আলবোলা, ডাইনে একটা পান্না বসান ফুরাস, বাঁয়ে একটা হীরে বসান টোপ্‌দার গুড়গুড়ি ও পেছনে একটা মুক্তোবসান পেঁচুয়া পড়লো ; বাবু আঁস্তাকুড়ের

কুকুরের মত ইচ্ছা অনুসারে আশে পাশে মুখ দিচ্চেন ও আড়ে আড়ে সাম্‌নে বাজে লোকের ভিড়ের দিকে দেখচেন—লোকে কোন্‌টার কারিগরির প্রশংসা কচ্চে; যে রকমে হোক, লোককে দেখাই চাই যে, বাবুর রূপো সোনার জিনিষ অঢেল, এমন কি, বসবার স্থান থাকলে আরো দুটো ফুর্‌সি বা গুড়গুড়ি দ্যাখান যেতো। ক্রমে অনেক অনাহুত ও নিমন্ত্রিত জড় হতে লাগ্‌লেন, বাজে লোকে চণ্ডীমণ্ডপ পুরে গেল। জুতো চোরে সেই লাঙ্গা-তরওয়ালের পাহারার ভেতর থেকেও দুঝুড়ি জুতো সরিয়ে ফেল্লে। কচ্ছপ জলে থেকেই ডাঙ্গাস্থ ডিমের প্রতি যেমন মন রাখে, সেইরূপ অনেকে দালানে বসে বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তার মধ্যে আপনার জুতোরও নজর রেখেছিলেন; কিন্তু ওঠবার সময় দ্যাখেন যে, জুতোরাম কচ্ছপের ডিমের মতো ফুটে মরেচেন। ভাঙ্গা ডিমের খোলার মত হয়ত একপাটি ছেঁড়া চটি পড়ে আছে

এদিকে দেখতে দেখতে গুড়ুম করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো: ছেলেরা "ব্যোম কালা কল্‌কেত্তাওয়ালী" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। বাবুর বাড়ি নাচ, সুতরাং বাবু আর অধিকক্ষণ দালানে বসতে পাল্লেন না, বৈঠকখানায় কাপড় ছাড়তে গেলেন, এদিকে উঠানের সমস্ত গ্যাস জ্বেলে দিয়ে মজলিশের উদ্‌যোগ হতে লাগ্‌লো, ভাগ্নেরা ট্যাসল দেওয়া টুপি ও পেটি পরে ফপর দালালি কত্তে লাগ্‌লেন। এদিকে দুই একজন নাচের মজলিশি নেমন্তন্নে আসতে লাগ্‌লেন। মজলিশে তরফা নাবিয়ে দেওয়া হলো। বাবু জরি ও কালাবৎ এবং নানাবিধ জড়ওয়া গহনায় ভূষিত হয়ে ঠিক একটি "ঈজিপশন্‌ মমী" সেজে মজলিশে বার দিলেন—বাই সারঙ্গের সঙ্গে

গান করে সভাস্থ সমস্তকে মোহিত কত্তে লাগ্‌লেন।

নেমন্তন্নেরা নাচ দেখতে থাকুন, বাবু ফররা দিন ও লাল চোখে রাজা উজীর মারুন—পাঠকবর্গ একবার সহরটার শোভা দেখুন—প্রায় সকল বাড়িতেই নানা প্রকার রং তামাশা আরম্ভ হয়েচে। লোকেরা খাতায় খাতায় বাড়ি বাড়ি পূজো দেখে বেড়াচ্চে। রাস্তায় বেজায় ভিড়। মাড়ওয়ালী খোট্টার পাল মাগীর খাতা ও ইয়ারের দলে রাস্তা পুরে গ্যাচে। নেমন্তন্নের হাত লাঠনওয়ালা বড় বড় গাড়ির সইসেরা প্রলয় শব্দে পইস্ পইস্ কচ্চে। অথচ গাড়ি চালাবার বড় বেগতিক। কোথায় সখের কবি হচ্চে, ঢোলের চাঁটি ও গাওনার চীৎকারে নিদ্রাদেবী সে পাড়া থেকে ছুটে পালিয়েচেন, গানের তানে ঘুমন্ত ছেলেরা মার কোলে ক্ষণে ক্ষণে চম্‌কে উঠ্‌ছে।

কোথাও পাঁচালি আরম্ভ হয়েচে, বওয়াটে পিল ইয়ার ছোকরারা ভরপুর নেশায় ভোঁ হয়ে ছড়া কাট্‌চেন ও আপনা আপনি বাহবা দিচ্চেন, রাত্তির শেষে শ্রাদ্ধ গড়াবে। অবশেষে পুলিসে দক্ষিণা দেবে। কোথায় যাত্রা হচ্চে, মণি গোঁসাই সং এয়েচে, ছেলেরা মণি গোঁসায়ের রসিকতার আহ্লাদে আটখানা হচ্চে, আশে পাশে চিকের ভেতর মেয়েরা উঁকি মাচ্চে, মজলিশে রামমশাল জ্বলচে, বাজে দর্শকদের বাতকর্ম্ম ও মশালের দুর্গন্ধে পূজোবাড়িতে তিষ্ঠন ভার, ধূপ ধুনোর গন্ধও হার মেনেচে। কোনখানে পুজোবাড়ির বাবুরাই খোদ মজলিশ রেখেচেন—বৈঠকখানায় পাঁচো ইয়ার জুটে নেউল নাচানো, বাং নাচানো, খ্যামটা ও বিদ্যাসুন্দর আরম্ভ করেচেন; এক এক বারের হাসের গর্‌রায় শিয়াল ডাকে ও মদন

আগুনের তানে—দালানে ভগবতী ভয়ে কাঁপচেন, সিঙ্গি চোরাকে কামড়ান পরিত্যাগ করে ন্যাজ গুটিয়ে পালাবার পথ দেখ্‌চে, লক্ষ্মী সরস্বতী শশব্যস্ত। এদিকে সহরের সকল রাস্তাতেই লোকের ভিড়, সকল বাড়িই আলোময়।

এই প্রকারে সপ্তমী, অষ্টমী ও সন্ধিপূজো কেটে গ্যালো; আজ নবমী; আজ পূজোর শেষ দিন; এতদিন লোকের মনে যে আহ্লাদটি জোয়ারের জলের মত বাড়তেছিল, আজ সেইটির একেবারে সার ভাটা।

আজ কোথাও জোড়া মোষ, কোথাও নব্বুইটা পাঁঠা, সুপারি, আক, কুমড়ো মাগুর মাছ ও মরিচ বলিদান হয়েচে; কর্ম্মকর্ত্তা পাত্র টেনে পাঁচো ইযারে জুটে নবমী গাচ্চেন ও কাদামাটি কচ্চেন ঢুলীর ঢোলে সঙ্গত হচ্চে, উঠানে লোকারণ্য, উপর থেকে বাড়ির মেয়েরা উঁকি মেরে নবমী দেখচেন। কোথাও হোমের ধূমে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গ্যাচে, কার সাধ্য প্রবেশ করে—কাঙ্গালী, রেওভাট ও ভিক্ষুকের পূজোবাড়ি ঢোকা দূরে থাকুক, দরজা হতে মশাগুলো পর্য্যন্ত ফিরে যাচ্চে। ক্রমে দেখতে দেখতে দিনমণি অস্ত গ্যালেন। পূজোর আমোদ প্রায় সম্বৎসরের মত ফুরালো। ভোরাও ওক্তে ভয়রো রাগিনীতে অনেক বাড়িতে বিজয়া গাওয়া হলো। ভক্তের চক্ষে ভগবতীর প্রতিমা পরদিন প্রাতে মলিন মলিন বোধ হতে লাগ্‌লো। শেষে বিসর্জ্জনের সমারোহ সুরু হলো,—আজ নিরঞ্জন।

ক্রমে দেখতে দেখতে দশটা বেজে গ্যালো; দইকড়মা ভোগ দিয়ে প্রতিমার নিরঞ্জন করা হলো। আরতির পর বিসর্জ্জনের বাজনা বেজে উঠলো; বামুন বাড়ির প্রতিমারা সকালেই জলসই হলেন।

বড় মানুষ ও বাঙ্গে জাতির প্রতিমা পুলিসের পাশ মত বাজনা বাদ্দির সঙ্গে বিসর্জ্জন হবেন—এদিকে এ কাজ সে কাজে গির্জ্জার ঘড়িতে টুং টাং টুং টাং করে দুপুর বেজে গ্যালো, সূর্য্যের মৃদু তপ্ত উত্তাপে সহর নিম্‌কী রকম গরম হয়ে উঠ্‌লো, এলোমেলো হাওয়ায় রাস্তার ধূলো ও কাঁকর উড়ে অন্ধকার করে তুল্লে বেকার কুকুরগুলো দোকানের পাটাতনের নীচে ও খানার ধারে শুয়ে জিব বাইর করে হাঁপাচ্ছে, বোঝাই গাড়ির গরুগুলোর মুখ দে ফ্যানা পড়চে—গাড়োয়ান ভয়ানক চাৎকারে "শালার গরু চলে না" বলে ন্যাজ মলচে ও পাঁচনবাড়ি মাচ্চে, কিন্তু গরুর চাল বেগড়াচ্চে না, বোঝাইয়ের ভরে চাকাগুলি কোঁ কোঁ শব্দে রাস্তা মাতিয়ে চলেচে। চড়াই ও কাকগুলো বারাণ্ডা, আল্‌সে ও নলের নীচে চক্ষু মুদে বসে আছে। ফিরিওয়ালারা ক্রমে ঘরে ফিরে যাচ্চে, রিপুকর্ম্ম ও পরামাণিকরা অনেকক্ষণ হলো ফিরেচে, আলু, পটোল! ঘি চাই! ও তামাকওয়ালা কিছুক্ষণ হলো ফিরে গ্যাচে। ঘোল চাই মাখন চাই! ভয়সা দই! ও মালাই দইওয়ালারা ক ড় ও পয়সা গুন্‌তে গুন্‌তে ফিরে যাচ্চে। এখন কেবল মধ্যে মধ্যে পানিফল! কাগোজ বদোল! পেয়ালা পিরিচ—বিলাতা খেলনা বর্ত্তন চাই পেয়ালা পিরিচ! ফিরিওলাদের ডাক শোনা যাচ্ছে—নৈবিদ্দি মাথায় পূজোবাড়ির লোক, পূজুরী বামুন, পটো ও বাজন্দার ভিন্ন রাস্তায় বাজে লোক নাই। গুপস্‌ করে একটার তোপ পড়ে গ্যালো। ক্রমে অনেক স্থলে ধূমপানে বিসর্জ্জনের উদ্‌যোগ হতে লাগ্‌লো।

হায়! পৌত্তলিকতা কি শুভ দিনেই এ স্থলে পদার্পণ করে-

ছিল, এত দেখে শুনে মনে স্থির জেনেও আমরা তারে পরিত্যাগ কত্তে কত কষ্ট ও অসুবিধা বোধ কচ্চি, ছেলেবেলা যে পুতুল নিয়ে খেলাঘর পেতেচি, বৌ-বৌ খেলেচি ও ছেলেমেয়ের বে দিয়েচি, আবার বড় হয়ে সেই পুতুলকে পরমেশ্বর বলে পূজো কচ্চি। তাঁর পদার্পণে পুলকিত হচ্চি ও তাঁর বিসর্জ্জনে শোকের সীমা থাকচে না—শুধু আমরা কেন—কত কত কৃতবিদ্য বাঙ্গালী সংসারের ও জগদীশ্বরের সমস্ত তত্ত্ব অবগত থেকেও হয় ত সমাজ, না হয় পরিবার পরিজনের অনুরোধে পুতুল পুজে আমোদ প্রকাশ করেন, বিসর্জ্জনের সময় কাঁদেন ও কাদারক্ত মেখে কোলাকুলি করেন, কিন্তু নাস্তিকতায় নাম লিখিয়ে বনে বসে থাকাও ভাল তবু "জগদীশ্বর একমাত্র" এটি জেনে আবার পুতুল পূজায় আমোদ প্রকাশ করা উচিত নয়।

ক্রমে সহরের বড় রাস্তা চৌমাথা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, বেশ্যালয়ের বারণ্ডা আলাপীতে পুরে গ্যালো, ইংরাজি বাজ্‌না, নিশেন, তুরুকসোয়ার ও সার্জ্জন সঙ্গে প্রতিমারা রাস্তায় বাহার দিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন—তখন "কার প্রতিমা উত্তম" "কার সাজ ভাল" "কার সরঞ্জাম সরেস" প্রভৃতির প্রশংসারই প্রয়োজন হচ্চে, কিন্তু হায়! "কার ভক্তি সরেস" কেউ সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে না—কর্ম্মকর্ত্তাও তার জন্য বড় কেয়ার করেন না। এ-দিকে, প্রসন্নকুমার বাবুর ঘাট ভদ্দরলোক গোছের দর্শক, ক্ষুদে ক্ষুদে পোশাক পরা ছেলে মেয়ে ও ইস্কুলবয়ে ভরে গ্যালো। কর্ম্মকর্ত্তারা কেউ কেউ প্রতিমে নিয়ে ব্যচ খেলিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন—আমুদে মিন্‌সে ছোঁড়ারা নৌকোর ওপর ঢোলের সঙ্গতে নাচতে লাগ্‌লো।

সৌখীন বাবুরা খ্যাম্‌টা ও বাই সঙ্গে করে বোট, পিনেস ও বজ্‌রার হাতে বার দিয়ে বস্‌লেন—মোসাহেব ও ওস্তাদ চাকরেরা কবির সুরে দু একটা রংদার গান গাইতে লাগ্‌লো।

বিদাও হও মা ভগবতি এ সহরে এসো নাকো আর।
দিনে দিনে কলিকাতার মর্ম্ম দেখি চমৎকার॥
জষ্টিসেরা ধর্ম্ম অবতার, কায়মনে কচ্চেন সুবিচার।
এদিকে ধুলোর স্বরে রাজপথেতে চেঁচিয়ে চেয়ে চলা ভার।
পথে হাগা মোতা চলবে না, লহোরের জল তুলতে মানা।
লাইসেন্সটেক্স মাথট চাঁদা, পাইখানার বাসি ময়লা রবে না।
হেলথ অফিসর, সেতখানার মেজেষ্টর
ইন্‌কমের আসেসর মাল্লে সবারে ;
আবার গবর্ণরের শুয়ে দৃষ্টি সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার।
অসহ্য হতেছে মা গো! অসাধ্য বাস করা আর।
জীয়ন্তে এই ত জ্বালা মা গো,
মলে ও শাস্তি পাবে না,
মুখাগ্নির দফা রফা কলেতে করবে সৎকার।
হুতোম দাস তাই সহর ছেড়ে আস্‌মানে করেন বিহার।

এদিকে দেখতে দেখতে দিনমণি যেন সম্বৎসরের পূজোর আমোদের সঙ্গে অস্ত গ্যালেন। সন্ধ্যাবধূ বিচ্ছেদ বসন পরিধান করে দেখা দিলেন। কর্ম্মকর্ত্তারা প্রতিমা নিরঞ্জন করে, নীলকণ্ঠ শঙ্খচিল উড়িয়ে "দাদা গো" "দিদি গো" বাজনার সঙ্গে ঘট নিয়ে ঘরমুখো হলেন।

বাড়িতে পৌঁছে চণ্ডীমণ্ডপে পূর্ণঘটকে প্রণাম করে শান্তি জল নিলেন, পরে কাঁচা হলুদ ও ঘটজল খেয়ে পরস্পর কোলাকুলি কল্লেন। অবশেষে কলাপাতে দুর্গানাম লিখে সিদ্ধি খেয়ে বিজয়ার উপসংহার হলো। কদিন মহাসমারোহের পর আজ সহরটা খাঁ খাঁ কত্তে লাগ্‌লো—পৌত্তলিকের মন বড়ই উদাস হলো, কারণ লোকের যখন সুখের দিন থাকে তখন সেটির তত অনুভব কত্তে পারা যায় না, যত সেই সুখের মহিমা দুঃখের দিনে বোঝা যায়।

'হুতোম প্যাঁচার নকশা' গ্রন্থ হইতে সংকলিত।

নিধিরামবাবুর কি নিষ্ঠা

নিধিরামবাবু সহরের একজন নামদার লোক, কিন্তু ডাক সাইটে মাতাল এবার মায়ের পূজা হইবে বলিয়া দেশশুদ্ধ রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে, অথচ প্রতিমাদির কোন আয়োজন নাই। এদিকে সামিয়ানা উঠিয়াছে, ঢুলিরা তাক্ ডাক্সিন বাজাইতেছে, মা কৈ মা কৈ বলিয়া পাড়ার মেয়েরা সব দেখিতে আসিতেছে! কিন্তু সব ফক্কিকা নিধিরাম চতুর্থীর দিনে প্রকাণ্ড দুই মদের পিপে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আর যত রকমের ভাল ভাল বিলিতী মদ আছে, হরেক রকম ও নানা রঙ্গের আনাইয়া পূজার দালান সাজাইলেন। দেখতে মন্দ নয়। মদের জার ঘট করিয়া তাহার উপর ঝলসান গরুর একটি মুড়ো রাখিয়া দিলেন। কতগুলি লাল জবাফুলের মালা দিয়া তাহা ঢাকিলেন। চারিদিকে নৈবেদ্যের কি ঘটা, ফাউল করি মটন চপ্ পচা পোকা পড়া শুয়োরের মাংস ডিমের উপর কেমন বিরাজমান। পুরুত ঠাকুর কোশাকুশীতে মদ ঢালিয়া দিয়া অগ্রে আচমন করিতে বসিলেন। ইয়ারের দলও ক্রমে উপস্থিত হইতে লাগিল লাল চেলির কাপড় পড়িয়া কপালে এক রক্ত চন্দনের ফোঁটা কাটিয়া বাবু পূজোতে বসিলেন। তার গুরু ঠাকুর ও পুরুত ঠাকুর এয়ারের দলে ছিলেন। সকলে আচ্ছা

রকমে দু চার গেলাস ঢালিয়াছেন। বাড়ীর ঢুলিগুলো মদে তর হইয়া আর ঢোল বাজাইতে পারিতেছে না। সব ঢ্যাব ঢ্যাব করিতে লাগিল। নিধিরাম বাবুর কেমন শক হইল। কৈ-বাবা পুরুত চণ্ডী পড় ?

পুরুত। আজ্ঞে হ্যাঁ এই পড়ি আর কি।

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমোনমঃ
যা দেবী ভদ্রলোকেষু বোতলরূপেণ সমস্থিতা
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমোনমঃ
যা দেবী ভদ্রলোকেষু খানারূপেণ সমস্থিতা
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমোনমঃ
যা দেবী ভদ্রলোকেষু জন্তুরূপেণ সমস্থিতা
অথদেবী মাহাত্ম্য বর্ণনং নাম দশমোধ্যায়ঃ।

॥ স্তব ॥

গোরগুড়া রক্তবর্ণা ভগবতা মাংস পাচিকা
তেজস্বিনী ভীমরূপা দুর্গন্ধ জলরূপিনী
শিক্ষিতানাং প্রিয়তমা শুণ্ডিকালয়শোভিনী
যকৃৎ পরিবর্দ্ধিনাচেব জাতিভেদাবিনাশিনী
যে ভজন্তি তব পদং ছুছুন্দরসমাং গতি
দিনে দিনে প্রাপ্নবন্তি নরকে যান্তি তে পুরাঃ।

বাড়ীর ভোলা চাকরটা কেবল নিরামিষ ছিল। মায়ের বলি না হইলে কি পূজা হয় ? বাবুরা তাহাকেই ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন, সে ত কোন রূপে অব্যাহতি পাইল।

নিধিরাম একদিন আলিপুর চিড়িয়াখানা দেখিতে যান। সেখানে বেগতিক হওয়াতে কিছু উত্তম মধ্যম খাইয়া আসেন। সেই কথা এক সানকের এযার কাছে বলিয়া মনের দুঃখ নিবারণ করিলেন। বন্ধুবা তখন ও ধরাশায়ী হন নাই, কিছু হুঁস আছে।

বলি আমরা তোমার দুঃখে সিম্পাথাইজ করি। আমরা থাকিতে চিড়িয়াখানা দেখবার দরকার কি বাবা। এস! এই বলিয়া কেহ গরু, কেহ ভ্যাড়া, কেহ বা ছাগল হইলেন। নিধিরাম বলিলেন তবে আমি ঘাশ হই। আমাকে তোমরা খাও। ইহারা সকলে তাঁর মোটা শরীর পাইয়া চিবিযা রক্ত বাহির করিয়া দিল তখন ভোলা চাকর এসে তাঁহাকে বাঁচায়।

১২৮৬ সাল এর ২রা কার্ত্তিক সংখ্যা 'সুলভ সমাচার' হইতে সংগৃহীত।

পুরাতনী বিচিত্রা

(১)

পালে পার্বণে দেবভক্তি যত থাকুক আর না থাকুক পেট পূজাটা ষোড়যোপচারে চলে ভাল এখন পূজার সময় সাত্বিকভাব কম। কেবল মহাপ্রসাদের ছড়া-ছড়ি। এক ব্রাহ্মণ প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করিতেন, কিন্তু হঠাৎ পূজা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে পাড়ার লোক কানাকানি করিতে লাগিল, তার মধ্যে মুখড়া রকমের এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল মুখুজ্যে মহাশয! আপনি পূজা বন্ধ করিলেন কেন? ব্রাহ্মণ মুচকে মুচকে হেঁসে বলিলেন আর বাবা। দাঁত নাই যে।

সুলভ সমাচার ১৮ই অক্টোবর ১৮৭৯ ২রা কার্ত্তিক ১২৮৬

চাকুরে

অখিল চন্দ্র লাহিড়ী

আশায় বাঁধিয়া বুক,
অবহেলি, যত সুখ,
কাটাইনু বহু কষ্টে সুদীর্ঘ বরষ
ফেলিয়া মাথার ঘাম,
পায়ে, নিত্য, অবিরাম,
লভিতে শান্তির ছায়া কোমল পরশ।

কোন্ গ্রহ অনুকূল,
কোন্ গ্রহ প্রতিকূল
কিছুই জানিনা হায়, কি যে পরিণাম।
আশায় দিয়েছি জল,
দেখিতে কি ফলে ফল,
হ'বে কি না হ'বে মোর পূর্ণ মনস্কাম।

দেশেতে দিয়েছি চিঠি,
—আগে যা'ক্ সব মিটি,
ছুটী নিয়ে আপিষের যত গোলযোগ,

ছোট বড় যত বাবু,
ভেবে চিন্তে সবে কাবু,
কে বা জানে কা'র ভাগ্যে কি যে আছে ভোগ ?

যা'র যত আছে বাকী,
ক্রমে ক্রমে দিতে থাকি,
ভাবা মিছে, যা' হ'বার হ'বে তাই পরে ;
গোয়ালিনী শ্রীবেদানা,
পা'বে পৌনে তের আনা,
দিতে হ'বে, যদিও সে দুধে ভেল করে।

কানাই—পরামানিক,
রজক —কালামানিক,
টাকা সওয়া দুই হ'বে উভয়ের অংশ।
—কাক্ ঠুক্‌রো চুল গুলি,
নব বস্ত্র ঝুলি-ঝুলি,
যাই হ'ক্ দুজনারই আলো হ'ক্ বংশ।

ছোলা ভাজা, মটর ভাজা,
পাঁউরুটী, আর নিম্‌কি খাজা,
—এক টাকা সাড়ে পাঁচ আনা
হবে ইত্যাদিতে।

পূজায় দেশে যা'ব বলায়,
ছেঁড়া ছাতাটী রিফু করায়,
খলিপেজি বলে, "সোয়া চা'র আনা
নিশ্চই হ'বে দিতে"

পাচক দানবন্ধু পানি.
কেমন রাঁধেন তাও না জানি.
সাত আট-আনি তিনিও পা'বেন,
—দেখা গেল তাঁর ফর্দ্দে,

লাইব্রেরীতে পাড়তো ছাই,
বচরে কিন্তু টাকা আড়াই,
এক ট্রাঙ্ক, নিতে টাকা হেঁকে আছে
পুরো তিনটি মর্দ্দে।

আপিষ-মহালের শ্রীনন্দলাল,
আজকাল যেন নন্দ-দুলাল,
দু'মাসে দু'দিন দেখা মেলে তা'র,
এখন কিন্তু 'ভু' 'বি' 'হু'

মাথা চুলকা'য়ে বলে ও মশাই,
গোলামের মা বাপ্‌ সবই আপ্‌নারাই,
অষ্ট গণ্ডা চায় পার্ব্বণ সেলামি,
ত্যক্ত করে মুহুর্ম্মুহু।

পিয়ন বেটা যেন ন'দের গোঁসাই,
কিম্বা শ্বশ্রুজার মাস্‌তুতো ভাই,
তবে দু'জনাই কোম্পানীর চাকর,
সম্বন্ধটা গুরুতর।

নিমু খান্‌সামা, তেল-আলি, চা'ল-আলি,
মেথরানী, আর মুদি—বনমালী,
পাঁচ আধুলি দেবেন পাঁচ জনে ঠুকে,
আরো আছে এরপর।

ছেলে পিলেদের পোষাক ধুতি জামা,
উল, কাঁটা, বডি, জ্যাকেট, বিনামা,
পরে হ'বে ব'লে রেখে দিলে পরে,
বাজার উঠে যা'বে চ'ড়ে;

রবি বমার খান কত পিক্‌চার,
দাদা মশাইর টনিক মিক্‌শ্চার,
পয়লা বৌদিদির নিকেলের চুড়া,
মাখনদা'র দাবা-ব'ড়ে।

ময়নাটি না পেলেই গালে প'ড়বে হাত,
পাড়া-পড়্‌শীই যত করে উৎপাত,
পুঁজি যত, তা'র ডবল ফরমাইজ:—
নিলেও, পরে বলেন টাকা নাই;

দিদিমা পিসিমা জেঠাইমা মাসীমা,
কা'র যে কত চাই নাইক তা'র সীমা,
বার তের খানা নামাবলী, আর
ডজন তুই তিন মালাই।

গত সপ্তাহে গিন্নার এক পত্রে
লেখাছিল প্রায় পঞ্চাশটী ছত্রে,
সাজ, সরঞ্জাম, এটা, ওটা, সেটার
মস্ত একখানা লিষ্টি ;—

যাক্ ওসব কথা, ছুটি পেলেই হয়,
নইলে যত আশা কিছুই কিছু নয়,
মাসেক ছুটী পেলে ইষ্টি দেবতায় দে'ব
সোয়াসের তুধ, মিষ্টি।

আইন-সঙ্গত অষ্ট দিন ছুটী ;
হায়, তারি জন্য এত ছুটাছুটি।
যত ছিল আশা, যেতেই ফুরা'বে
আসা হ'বে বিষম দায় ;

হায় রে প্রবাস, হায় রে গোলামী,
হায় কি কঠিন আক্কেল সেলামি !
আনন্দময়ি মা ! আর নিরানন্দে
রে'খ না প্রাণ যে যায় ॥

"পূজার পাগল" গ্রন্থ থেকে সংকলিত

———

"দুর্গোৎসব ;—উদ্ভটকাব্য"।

শ্রীষণ্ডানন্দ শর্ম্মা।

উৎসব।

দেখিতে দেখিতে দেখি গেল ক'টা মাস,
শরৎ আসিয়ে পুনঃ হইল প্রকাশ,
নূতন বসন সঙ্গে এল পুনরায়,
বঙ্গে রঙ্গ মহা 'ধূম' দেবীর পূজায়,
বাজিয়ে উঠিল পুনঃ মধুর বাজনা,
ঢাক ঢোলে দুর্গোৎসব করিল ঘোষণা;

—০—

স্কুল অফিস আদি হয় বন্ধ,
নাচিয়ে উঠিছে প্রাণ অপার আনন্দ,
স্ত্রী পুরুষ বাল্য বৃদ্ধ ধনী বা নির্ধন,
বাঙ্গালী মাত্রেই আজ প্রফুল্লিত মন,
কি নগর কিবা পল্লি সহর বাজার,
সকল স্থানেই 'পূজা' করিছে বিহার;
কেহ কিনে কেহ বেচে কেহ করে গোল,
পূজার প্রারম্ভ—আজ—সকলই চঞ্চল;

গরম হ'তেছে ক্রমে পূজার বাজার,
এতই দুর্মূল্য দ্রব্য "স্পর্শ করা ভার" ;
"স্পর্শ করা ভার' তবে কেন কর ক্রয় ?
"পূজার সামগ্রী এ-যে না হইলে নয়।"

—•—

বসন বিক্রেতা দর্জ্জী আর চর্ম্মকার,
করেছে সুদৃঢ় পণ লুঠিবে সংসার :
অবিশ্রান্ত গণিতেছে টাকা আনা পাই
বেছে বেছে বেচে যত 'কত কেলে ছাই',
কভু হাসে মৃদু মৃদু চেয়ে মুখ পানে,
কোথায় পালাবে আর পেয়েছে দোকানে :
যা এনেছ তাই লবে হবে আরও ধার,
জাননা বৎসর পরে পূজার বাজার।

—•—

প্রবাসী ভাবিছে কবে যাইবে ভবন,
'যেয়েও যায় না দিন' এত উচাটন ;
দু'টী বেলা ছুটি দিন করিছে গণনা,
আশায় মিশায়ে কত রূপ কল্পনা:
পিতা মাতা ভগ্নী ভ্রাতা পুত্র কন্যাগণে,
'পূজা' সন্নিকটে সদা পড়িতেছে মনে ;
সদা পড়িতেছে মনে সে 'বিধু বদন'—
প্রেয়সীর সে কটাক্ষ চটুল নয়ন,—

সেই সুমধুর হাসি—প্রাণ ভরা সুখ.
বিদায় কালের সেই মিষ্টি কান্নাটুকু ,—
একেবারে সব আসি পড়িতেছে মনে
"যেয়ে ও যায় না দিন কেনরে এক্ষণে"
প্রণয়িনী মনে মনে পড়ে কোন কথা.
হয়ত দিতেছে কা'রও প্রাণে কত ব্যাথা ,
'আসিবার কালে আহা তাঁর 'সুলোচনা
'চেয়েছিল একখানি 'সাধের গহনা'
সুলোচনাও হেসে হেসে দৃঢ় অঙ্গীকার.
করিয়াছিলেন ;—'চিক'— দিবেন এবার ,-
কিন্তু কোথা চিক ! সব অলীক বচন.,
তাই হর্ষে বিষাদিত বাবুটীর মন.
সোজা কথা নয় সে'ত "সাত ভরি সোনা"
কিসে হয় অত 'উঁচু দরের গহনা' ?
যখন সুধাবে আসি 'রসময়ী রাই'
'এবার কি প্রিয়তম এনেছ হে তাই'
কি উত্তর বাটী গিয়ে দিবেন প্রিয়ায়.
তাই ভেবে 'প্রিয়তম' ব্যকুলিত হায় !
কি ভয় হে রসময় ? যাও চলে ঘর,
'বলো 'প্রাণ' দিব চিক আগামী বৎসর' ।
নবীন বয়স বাপু জাননা বিশেষ,
পাও নাই পিরীতের ভাল উপদেশ.

তাই হে আশঙ্কা এত অন্তরে তোমার—
ও রূপ হইয়া থাকে কত 'অঙ্গীকার'।

—·—

কোথাও ভাবিছে আহা কত শত জন
'পূজার কাপড় হবে পাইলে বেতন'
'তাতেও কি হবে হায়! সব সঙ্কুলান',
কি হবে ভাবিয়ে কিছু না পান সন্ধান।
তাহে চান 'এক জন' মহার্ঘ বসন
সকলে(ই) বুঝিল তিনি বুঝিবার নন।

আবার এখনও শেষ হয়নি "চাকরী"
ছুটীর উদ্যমে কাজ তিনগুণ ভারি
সারিছে 'কেরানী' কুল তাড়াতাড়ি কাজ,
রাত্রের ট্রেণেও যদি যেতে পারে আজ।

—০—

কর্ম্মস্থল হ'তে যাত্রা কত মহাজন,
চলেছেন তরী পরে করি আরোহণ
'বাটীতে প্রতিমাখানি হয়েছে নির্ম্মিত'
'পূজার সামগ্রী সব নিজের সহিত
রহিয়াছে',—ভাবিছেন গণিছেন দিন
"কেমনে পৌঁছিব গিয়া পঞ্চমীর দিন",

—০—

এ দিকে রমণীগণ বঙ্গীয় ভবনে,
ভাবিছেন কত রূপ 'পূজা' আগমনে
অপার অপত্য স্নেহে জননী হৃদয়,
পরিপূর্ণ সত্ত্ব—উদ্বেলিত এ সময় ;
ভাবিছেন আহা মাতা দিবস রজনী,
কখন আসিবে তাঁর নয়নের মণি,
বারেক দেখিয়া যেন সন্ততির মুখ,
ঘুচাবেন স্নেহময়ী বৎসরের দুঃখ ;

—•—

কাহারও আসিবে ভাই কাহারও জামাই,
কাহারও আসিবে শ্যালার নাতির বিহাই ;
যে কিছু সম্বন্ধ আছে এ সৃষ্টি সংসারে,
সকলে (ই) আসিবে বাড়ী পূজার ব্যাপারে ;

সকলের (ই) 'হিরেমন' আসিবেন প্রায়,
পিরীতের ঢেউ প্রাণে গড়াইয়ে যায় ;
থই থই করে রস বাহির ভিতর,
আসে আসে আসে এই প্রাণের নাগর ;
কতই উঠিছে মনে ভাবের তরঙ্গ ;
"কতক্ষণে হবে সই আহা তার সঙ্গ,
"হয়েও হয় না দিন যেয়েও না যায় ;
"কখনও আসিবে আর রাত যে পোহায়,

"এসে গেছে বাড়ী প্রায় সকলেই পাড়ার ;
"তাহার (ই) কেবল নাহি নাম আসিবার,
"কি জানি কি হ'ল তথা পেলে কি না ছুটী ;
"প্রতিবার এসে থাকে এই দিন বাটী ;
"আজ না আসিলে আর আসিবে বা কবে,
"আসিবে কি যবে পূজা ফুরাইয়া যাবে ?
"কিছুই পূজার আজও হ'ল না আমার,
"কি জানি কেমন ছি ছি আক্কেল বা তার,
"একান্তই যদি তার না হইল ছুটী,
"কেন না পাঠায়ে দিল সেই দ্রব্য কটী ;
"তাও কিছু বেশী নয় নিতান্ত যা চাই,
"একখানা লাল-গুল বসান ঢাকাই,
"বাবু ধাক্কা পাছাপেড়ে আর একখানা,
"গোলাপীর মত,—তাও আছে তার জানা ;
"দু'টী "বডি" শাটিনে, তাও বেশী নয়,
"এখনও আসে যদি তবু কাজ হয়।
"যা হ'ক এবার তারে ছাড়িব না আর,
"যেথা যাবে সেথা যাব সঙ্গে সঙ্গে তার"
এতেক যখন তিনি ভাবিছেন মনে,
প্রাণের 'গোলাম' তাঁর পৌঁছেন ভবনে।

—•—

কোথাও বা বসি আহা বাতায়নোপরি,
প্রাণেশের প্রতীক্ষায় আছেন সুন্দরী ;
অনিমেষ দৃষ্টে পথ করি নিরীক্ষণ,
অজ্ঞাতে দেখিছে সতী সুখের স্বপন ;
কোথাও করিছে সদী শয্যার রচনা ;
আপাদ মস্তক পদী পরিছে গহনা ;
গহনা পরিছে আর ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে,
মৃদু মৃদু হেসে মুখ দেখিছে দর্পণে ;
খুলিয়ে দিতেছে বেণী বাঁধছে আবার—
প্রতিজ্ঞা পদীর আজ নাশিবে সংসার ;
তাই কত করেও যেন উঠিছে না মন,
সমর-সজ্জার আর ভারি আয়োজন ;
শোভিছে অলক্ত রাগে পদার চরণ,
সর্ব্বাঙ্গে ঝুলিছে হিরা কাটা-ডায়মন ;
বসন পরিছে পদী বাছিয়ে বাছিয়ে,
আতর 'অটোডি রোজ' ঘরে 'ছড়া' দিয়ে ;
ঈষদ্ কজ্জল রেখা বঙ্কিম নয়নে,
(বঙ্কিম নয়ন এই নূতন যৌবনে),
কোথায় মদন আর কোথা 'পঞ্চবাণ',
পদির নয়নে আজ অধিক সন্ধান
অবিরত 'ইলেকট্রিক' ক্ষরিতেছে তায়,
পরশের পূর্ব্বে (ই) প্রাণ ঘুরে পড়ে যায়।

'সর্ব্বনাশ' করে বাস সুকৃষ্ণ নয়নে,
উত্তেজনা মাত্র তার ঈষদ অঞ্জনে।
এতই বিক্রম একা নয়নের তার,
অতএব অন্য অঙ্গ দেখাবনা আর ;
কি জানি পাঠক এই পূজার বাজারে,
গৃহিনীরে ভুল পাছে পদীর বাহারে।
অঙ্গঝাড়া দিয়ে পদীর উঠিয়ে দাঁড়ায়,
মুকুরে নেহারে মুখ বাঁধায়ে গ্রীবায়।
করেতে কুসুম-মালা তাম্বুল অধরে,
নিবিড় নিতম্বে চন্দ্র-হার ক্রীড়া করে ;
কবরী উপরে স্বর্ণ "প্রজাপতি" দ্বয়,
কেঁপে কেঁপে কেঁপে যেন কত কথা কয় ;
বলে "চেয়ে দেখ মোরা" কত ভাগ্যবান,
রূপসীর শিরে শোভি সবার প্রধান ;
স্বভাব গোলাপ-আভ চিবুক তাহার,
এক্ষণে পাউডার রাগে রঞ্জিত আবার ;
কেন ওলো পদ্মমুখী এই অত্যাচার,
হেন "রোজি চিকে" কেন মাখিস পাউডার,
নিটোল উজ্জ্বল কিবা মার্জ্জিত অধর ;
গরবে উন্নত যেন পীন পয়োধর ;
কণ্ঠস্থিত হার তায় হয়ে নিপতন ;
দুলে দুলে করে যেন মধুর চুম্বন ;

সুললিত বক্ষস্থল ইষদ্বিস্ফারিত,
মৃদুল সমীরে যথা কুসুম কম্পিত ;
মৃণাল ভুজেতে চুড় নূতন প্যাটন,
শান্তিপুর জিনি সূক্ষ্ম বাস পরিধান।
সজ্জা শেষ করি পদী দোলায়ে নিতম্বে :
ধীরে ধীরে বসে গিয়া সোহাগ 'পালঙ্গে',
তথায় আসিয়ে সদা রহস্য উড়ায়,
"কিস্‌মি কুইকের" গন্ধ কেন তোর গায়;
"কে করিবে কিস্‌গুলো, মিস্ প্রাণেশ্বর
"চড়েছেন ফাষ্ট ট্রেন এলনা খবর ?
পদী বলে "ওলো সদী তাও না জানিস ;
"তারেতে আমার কত এসে থাকে কিস্ ;
"টেলিগ্রাফে" আসে 'কিস্' 'স্পিস' টেলিফোনে;
"আমার শয়ন কক্ষে গোপনে গোপনে।
সদী বলে "তারে যদি আসে তোর 'কিস্',
'কাহার সে 'কিস্' তুই কেমনে জানিস্
পদী বলে "পোড়া মুখ মরণ তোমার",
"বুঝিস না আজও তুই চুম্বনের তার ;"
পদীর সে রসে আর রহস্য ছটায়
হেসে হেসে হেসে সদী গড়াগড়ী যায়।"

—•—

পাঠাতে পূজার তত্ত্ব উন্মত্ত সবাই,
বিশেষতঃ যাহাদের নূতন জামাই ;
মাসাবধি হ'তে হইতেছে আয়োজন,
বিবিধ সামগ্রি কত রকমই বসন ;
সুন্দর ইংরাজ-কর-নির্ম্মিত বিনামা ;
বিহীন হইলে তত্ত্ব সম্ভ্রম রবে না,
অতএব সাবধান হে শ্বশুর কুল,
দেখো করও নাকো যেন "তত্ত্বে" ভুলে ভুল ,
বিবিধ মিষ্টান্নসহ ইংরাজী বিনামা ;
না দিলে জামাইবাবু তুষ্টি রাখিবে না ;
সকলের আগে জুতা বাছিয়ে কিনিবে,
তবেই পূজার তত্ত্ব জুতাস্ত হইবে ;
তোষিতে জামাতৃ মন খালি জুতা নয়,
হা বিধাত ! পড়িয়াছে এমনই সময়,
সাবেক পূজার তত্ত্ব নাহি এবে আর,
এখন এযে তুষ্টি ছাড়া উৎখট্টা ব্যাপার,
আতর আবার কি বলে "এসেন্স ডিপ্যারিস"
একটীও যদি এর হয় কভু মিস্ ;
'সিগারাদি' নানা রূপ কত বিশেষণে ;
বিভূষিত হবে তত্ত্ব শ্বশুরের সনে ;
কন্যার কোমল কর করিয়ে অর্পণ,
শ্বশুর বেচারা নাজেহাল জ্বালাতন ;

কিন্তু হে জামাই বাবু বলি কানে কানে ;
তোমারও হইবে কন্যা থাকে যেন মনে।
পূরবে পশ্চিমে যায় দক্ষিণে উত্তরে,
পূজার তত্ত্বের ঢেউ দাসদাসী শিরে ;
ধুতী সাটী পরিপাটী, মিষ্টান্ন মিঠাই,
ছাঁচে ঢালা রসে ফেলা মাথা মুণ্ডু ছাই ॥

—o—

কত পরিবার মাঝে হয় হাহাকার,
'পূজার কাপড়' বুঝি না হ'ল এবার ;
কর্ত্তার কলহ হয় কলত্রের সাতে,
'কেমনে কাপড় হবে কিছু নাই হাতে' ;
কতদিন হতে কর্ম্ম নাহি কিছু তাঁর,
ভেবে ভেবে খুন্ন মন অখিল আঁধার ;
জীবিকা নির্ব্বাহ তরে ভেবে নিরুপায়,
গৃহিনী আসিয়ে কত বকিছেন তায় !
"ছি ছি ছি অভাগী আমি না হয় মরণ,
"নির্গুণের হাতে পড়ে হই জ্বালাতন ;
"কে শুনে দুঃখের কথা কহিব বা কারে,
"কিছুরই নাহিক স্থিতি এ পোড়া সংসারে,
"বৎসরের তিন দিন সকলেরই ঘরে,
"হাসি খুসী মিষ্টালাপ সকলই করে ;

"কিন্তু এই পোড়া ঘরে লেগেছে আগুণ,
"একটী আছেন যিনি সেটী ত নির্গুণ ;
"হুত গন্বা ভন্বা রাম নাহি কোন কাজ।
"কি পোড়া কপালে মনে নাহি পায় লাজ,
"দু' বেলা দাওয়ায় বসে খালি হুঁকো টানে ;
"এমন ক্ষমতা নাই কিছু কিছু আনে,
"পড়িয়াছে দেবীপক্ষ আজকে বোধন,
"কিনেছে কাপড় সবে কেমন কেমন,
"আমাদের কর্ত্তা ওই রাশভারি করে ,
"আছেন বসিয়ে ছি ছি ঘরের ভিতরে,
"পড়িছে সকল ছেলে নূতন বসন ,
"আমার বাছারা আহা অভাগীর ধন,
"এক রত্তি রাঙ্গা সূতা না পাইল হায় ,
দেখিলে তাদের মুখ বুক ফেটে যায়"
শেষে সতী পতি প্রতি করি' সম্বোধন
কহিল নীরস ভাবে বিরস বচন,
"কাপড় আনগে বাঁধা দিয়ে ঘটি থাল ,
"চুপ করে বসে আছ কি পোড়া কপাল।

এইরূপ ভাব হায় কত শত ঘরে,
হইতেছে এ সময় বসনের তরে ,
আপন হাতের বালা খুলে দেয় বালা,
কেহ বা খুলিয়ে দেয় চারু কণ্ঠমালা ;

কিনিতে বসন স্বীয় সন্ততি কারণ,
হাতে টাকা নাই তবু নয় নিবারণ ;
খুলে দেয় অঙ্গ হ'তে আভরণ চয়,
'পূজার কাপড়' এ'যে না হইলে নয় ;

সংসারের এইরীতি বুঝা নাহি যায়,
কেহ বা পুলকে পূর্ণ কেহ নিরুপায় ;
কা'র হয় সর্ব্বনাশ, কারও পৌষমাস,
কা'র চক্ষু ভরা জল কাহারও উল্লাস ;
উৎসব সময়ে (৩) হায় হেরি সেইরূপ,
কারও সুখ, কারও উথলিছে দুঃখ কূপ্ ;
কেহ বা বসন পরি করিছে আহ্লাদ,
কেহ বা তাহারি তরে ভাবিছে বিষাদ,
কেহ ছুটী পেয়ে কত ছুটিতে বেড়ায়,
কেহ অবকাশ ভাবে আবাসে না যায় ;

হাহাকার করে কত কেরাণীর দল,
আর (৩) কত নিম্নশ্রেণীর চাকর সকল ;
বড় বড় যাঁরা কিন্তু তাঁহাদের সব,
চলিতেছে, হায় খালি গরিব নীরব ;
মর্ম্মভেদী পরিশ্রম সামান্য বেতন।
বৎসরান্তে একবার যাইবে ভবন,—
তাহাতেও আহা কত বিঘ্ন বিড়ম্বনা ;
ছি ছি ছি চাকুরী করা এতই লাঞ্ছনা ;

ক্রমেতে হইল বন্ধ সব বিদ্যাধাম,
কিছু দিন তরে ছাত্র পাইল বিশ্রাম ;
আগামী পরীক্ষা দিতে সেই ছাত্রগণ,
পরীক্ষা মন্দিরে শীঘ্র করিবে গমন ;
তাহাদেরও হেরি যেন কিছু দুঃসময়,
হতেছে তাদের মনে কতই উদয় ;
অবিরত অধ্যয়ন করে নিরন্তর,
মুখেতে হাসিছে হাসি বিষাদ অন্তর ;
পরীক্ষার দিন প্রায় আসিল নিকটে,
কেমনে পাইবে ত্রাণ বিষম সঙ্কটে ;
এই ভেবে সারা হ'ল ছেলে বড় দল,
'পাসের' কারণ ত্রাশ, হয় বা পাগল ;
কেন ভাব বৎস ! 'পাস' হবে কোনরূপে,
যে কিছু আশঙ্কা তাহা, চাকুরী তুরূপে।

—০—

'নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ' হয় 'চণ্ডী পাঠ'
সংস্কৃতে বিপ্রগণ করে যেন হাট ;
পাঠে পরিপক্ক তাঁরা চণ্ডীর কৃপায়,
'যা দেবী সর্ব্ব ভুতেষু' গৃহিণী কোথায় ;
'ওঁ' বিষ্ণু তদো বিষ্ণু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা,
'ভাগ্য দোষে ওহে তিনি সর্ব্বদাপীড়িতা,
'নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ,—কেন আর অত,
'তর্করত্ন খুড়—'বিদে' পেয়েছিল কত ;

'নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ—দশ টাকা ঘড়া,
'এইবার পাবে খুড়ী গোট এক ছড়া ;
'নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ বড় আয়োজন,
'শতাধিক অধ্যাপক হবে নিমন্ত্রণ ;
যা দেবী সর্ব্বভূঃ—বিদ্যারত্ন মহাশয়
এবার নৈবেদ্যগুলো ক্ষুদ্র অতিশয় ;'
ক্রমেতে যখন হয় লোক সমাগম,
নমস্তস্যৈঃ সনে যুক্ত হয় নমঃ নমঃ।

'দুর্গোৎসব' উদ্ভটকাব্য' হতে সংগৃহীত

* * * * * * * *

পুরাতনী বিচিত্রা

(২)

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে "আমার ভাইদের লইয়া একটি দল বাঁধিলাম, আমরা, সকলে মিলিয়া সংকল্প করিলাম যে পূজার সময়ে আমরা পূজার দালানে কেহই যাইব না ; যদি কেহ যাই, তবে প্রতিমাকে প্রণাম করিব না। তখন সন্ধ্যাকালে আরতির সময় আমার পিতা দালানে যাইতেন। সুতরাং তাহার ভয়ে আমাদেরও তখন সেখানে যাইতে হইত। কিন্তু প্রণামের সময় যখন সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিত, আমরা তখন দাঁড়াইয়া থাকিতাম, আমরা প্রণাম করিলাম কিনা, কেহই দেখিতে পাইত না।"

শ্রী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
আত্মজীবনী

মনে মনে মায়ের পূজা

অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী

[১]

"চালাও চালাও—শীঘ্র চালাও,—যত শীঘ্র পারো তীরে নৌকা লাগাও; নচেৎ আর বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই।"

* * *

ব্রহ্মানন্দ বন্দোপাধ্যায় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। নিবাস—হুগলি জেলার অন্তর্গত বালিগ্রামে,—উত্তরপাড়ায়। চাকুরি উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে অধিক সময় থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে বাড়ী আসিতেন মাত্র। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পরিবার বড় অল্প নয়; একজন খঞ্জ অগ্রজ আছেন, দুইটী বিধবা ভগিনী আছেন, আট-নয়টী অপোগণ্ড ভাগিনেয় ভাগিনেয়ী আছে, আর দূর সম্পর্কের দুই চারিজন আত্মীয়ও প্রায় আছেনই। পত্নী শান্তিদেবীও বাটীতে থাকিতেন, কেবল এইবার স্বামীর অসুখ শুনিয়া পুরাতন ভৃত্য রামকান্তের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন। একটী মাত্র পুত্র—শিবানন্দ, বয়স আট বৎসর। সুদূর জলপথে জননীর সঙ্গে আসিবার ইচ্ছা না থাকিলেও, অনেক কাঁদাকাটা করিয়া সেও মায়ের সহিত আসিয়াছে।

ব্রহ্মানন্দ শাস্ত্র বিশ্বাসী ও সৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বিষয়ী হইলেও ধারণাটা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোকেরই ছিল। জমিদারের নায়েব হইলেও প্রজাপীড়ক বা প্রবঞ্চনার উপাসক ছিলেন না। নিত্য প্রাতঃকালে সন্ধ্যাবন্দনা পূজা পাঠ না করিয়া জলবিন্দু গ্রহণ করিতেন না, গীতা চণ্ডী তো তাঁহার তুণ্ডাগ্রে। এই সকল কারণে পাবনা জেলার নানা স্থানে তাঁহার বিশেষ সম্মান মর্য্যাদা ছিল। তিনি প্রতি বৎসর বালির বাড়ীতে মহাসমারোহে মহামায়ার শারদীয়া মহাপূজার অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার মনিব জমিদার হইতে নিম্নতম প্রজা পর্য্যন্ত সকলের নিকট হইতেই তিনি এই নিমিত্ত প্রচুর অযাচিত সাহায্য পাইতেন। এ অর্থের সমস্তই পূজায় ব্যয়িত হইত। ইহার এক কপর্দ্দক রক্ষা করাও তিনি মহাপাপ বলিয়া মনে করিতেন।

জগদম্বার কৃপায় তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। শরতের শশীর হাসির সহিত তাঁহার পত্নীর মুখের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আনন্দময়ীর পূজার আর বড় বেশীদিন বিলম্ব নাই। তাঁহারা নৌকাযোগে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নৌকার মধ্যে শান্তিদেবী, ভৃত্য রামকান্ত দুরন্ত শিবানন্দকে সামলাইতে ব্যস্ত। সেদিন আবহাওয়াটা বড় ভাল ছিল না। আকাশের এদিকে ওদিকে মেঘ ও এক আধখানা দেখা যাইতেছিল। দুস্তর পদ্মায় কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না, তাই সাবধানতার জন্য ব্রহ্মানন্দ নৌকার বাহিরেই রহিলেন। তাহার আশঙ্কা অমূলক হয় নাই। তাঁহারা কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ তাঁহার নয়ন পথে নিপাতিত হইল। তিনি দেখিলেন,—যেন কোন

ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে আপন কলেবর বিস্তার করিতে করিতে সেই মেঘ তাঁহাদের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। দেখিয়া তিনি আর স্থির হইয়া বসিতে পরিলেন না, দাঁড়াইয়া উঠিয়া নৌকা বাহক দিগকে সতর্ক করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই মেঘ আপন কলেবরে বিশ্ব জুড়িয়া ফেলিল। তাহার শ্যামলবর্ণে পদ্মার জল অধিকতর শ্যামলবর্ণ ধারণ করিল। এমন সময় প্রচণ্ড পবন প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে পদ্মা নাচিয়া উঠিল। নিম্নে জল তরঙ্গ, উপরে বায়ুতরঙ্গ, উভয় তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে দুর্বল তরী টলমল করিয়া উঠিল।

তাহার উপর শিবানন্দের ক্রন্দন ও তাহার মাতার ব্যাকুলতা ও ব্যস্ততায় তরী যেন যায় যায়। রামকান্তের অবিশ্রান্ত সান্ত্বনা না চলিলে তাহাতেই নৌকা নিমগ্ন হইবার কথা। ব্রহ্মানন্দ দেখিলেন আর রক্ষা নাই। তাই তারস্বরে তরী বাহকগণকে তরীখানি তীরে লাগাইবার জন্য ঘন ঘন অনুরোধ করিতে লাগিলেন, —"চালাও চালাও—শীঘ্র চালাও,—যত শীঘ্র পারো তীরে নৌকা লাগাও ; নচেৎ আর বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই।" চারিদিকেই আঁধারে আঁধার। চপলার চমকে চাহিতেও ভয় করে। জল ও জলদের গর্জ্জনে ব্রহ্মাকটাই ভেদ হইয়া যাইতে লাগিল। নৌকার মধ্যে ঝলকে ঝলকে জল আসিতে থাকিল। নাবিকগণ কেমন দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া গেল ; অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহারা তীরের দিক্ ঠিক করিতে পারিল না। তথাপি দাঁড় বাহিবার বিরাম নাই। ক্রমে তাহারা একে একে অবসন্ন হইয়া পড়িল,— একে একে হাল দাঁড় সকলই ছাড়িয়া দিল। তরণীখানিও বাঁই

বাঁই করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে জলমগ্ন হইল। জলের উপরে আর আরোহী দিগের কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হইল না, কেবল,— "জয় মা তারা ব্রহ্মময়ী" ধ্বনি অনেকক্ষণ ধরিয়া জল কল্লোলের সহিত খেলিয়া বিলীন হইয়া গেল।

অমাবস্যা। অর্দ্ধরাত্রি অতীত। ব্রহ্মানন্দের সংজ্ঞা হইল। "জয় মা তারা ব্রহ্মময়ী" বলিয়া তিনি নয়ন উন্মীলন করিলেন। যে নামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তিনি জলমধ্যে জীবিত সমাধি লইয়াছিলেন, সেই নামের আশ্রয় অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি তাহা হইতে ব্যুত্থিত হইলেন। এ সমাধি ও ব্যথানের মূলে—তিনি কিংবা তাঁহার অবলম্বিন নাম, কে কি ক্রিয়া করিলেন, কে বলিবে? ফলে তিনি নাম লইয়াই নিদ্রোত্থিতের মত ইতস্তত নয়ন চালিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিবেন কি? চারিদিকেই যে সূচিভেদ্য অন্ধকার! উঠিতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না; গাত্রে বড়ই বেদনা বোধ হইল। তাইতো কোথায় আছি;—কি অবস্থায় আছি—স্ত্রী পুত্রাদি—তাহারাই বা কোথায় কি অবস্থায় আছে,— এখানেই, বা অন্য কোথাও—জীবিত, বা মৃত,—এই সকল চিন্তা এইবার একে একে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। উৎকট উৎকণ্ঠায় তাঁহার অন্তরটা তোলপাড় করিয়া তুলিল। এই অধীর-তার মধ্যে তাঁহার কর্ণে এক সুদূরাগত সারিগান নিরাবিল সুধা-ধারার মত আসিয়া প্রবেশ করিল। সারিগান শুনিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন,— নদী নিকটেই, মাঝিরা মাছ ধরিতে ধরিতে ঐ গান গাহিতেছে, দূর হইতে দূরে—অতিদূরে যাইতে যাইতে গানটি ক্রমশ শ্রাবনের রাজ্য ছাড়াইয়া গেল, কিন্তু তাহা তাঁহার

হৃদয় রাজ্য ছড়াইতে পারিল না। এমন কি সেই গানই তাঁহার সকল চিন্তাকে তাড়াইয়া দিয়া একাই সমগ্র হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল।

তিনি শুইয়া শুইয়া কেবলই ভাবেন,—আহা মরি মরি মাঝিরা সব কি গানই শুনাইয়া গেল!

"ওরে একটা মনের কথা,—
ওরে দু'টো দেলের কথা কইরে,—
যদি দেখা পাই তারে।
একান্ন সহর বাহান্ন গলি—
ওরে কোন্ গলিতে খুঁজি,—
খুঁজিতে খুঁজিতে আমার,
হারাইল পুঁজিরে,—
যদি দেখা পাই তারে॥

সত্যই ;—যদি একবার তাহার দেখা পাই তো দু'টো মনের কথা প্রাণের কথা কহিয়া লই, কিন্তু তাকে পাই কোথা?—তা'কে এদেশ ওদেশ খুঁজিতে খুঁজিতেই যে এদিকে আমাদের আয়ু সাবাড়, —পুঁজিও কাবার!—তারা! তোর দেখা পাবার কি হবে মা?

ব্রহ্মানন্দ এই সারিগান উপলক্ষ্য করিয়া কত কথাই যে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এমন সময় হঠাৎ তিনি যেন কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন, দেখিতে দেখিতে দীপহস্তে একজন তেজোদীপ্ত বর্ষীয়ান্ বাবাজী তাঁহার গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

[৩]

বাবাজীর নাম—দুনিয়াদাস। তাঁহাকে তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কিছুই বলেন না। কেবল বলেন—আমার আবার নাম কি ?—আমি আপনাদের দাস,—সারা দুনিয়ার দাস। ব্রাহ্মণ নাই, চণ্ডাল নাই, বৃদ্ধ নাই, বালক নাই, স্ত্রী নাই, পুরুষ নাই, সকলকেই তাঁহার একই জবাব, বাবাজী নানা ভাষায় কথা কহিতে পারেন ; হঠাৎ দেখিয়া কোন্ জাতি কিছু বুঝিবার যো নাই। জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিলেও বলেন,—দাস জাতি! বেশ ও ব্যবহার দেখিয়াও বুঝা যায় না—ইনি কোন্ সম্প্রদায়ী ? কোন দেব বিশেষের প্রতি বাবাজীর অধিক প্রীতি বা বিদ্বেষভাব নাই ; সকলকেই তিনি সমান ভক্তি করিয়া থাকেন। বাহিরে তাঁহার এইরূপই ভাব, ভিতরে যদি উনিশ বিশ থাকে ত তাহা ভিতরের ঠাকুরের পরিজ্ঞাত। বাবাজী সকল সম্প্রদায়ীর সঙ্গে মিলেন মিশেন। মধুর কণ্ঠে সকল দেব দেবীরই মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভিক্ষালব্ধ অন্নে জাতি সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে অতিথি মাত্রেরই সেবানির্ব্বাহ করেন। তাঁহাদের মলমূত্রাদিও তাঁহার ঘৃণার উদ্রেক করে না। বাবাজীর বড় দয়ার শরীর। তিনি কাহারও কষ্ট দেখিতে পারেন না। দুঃখ দেখিলে তাঁহার নয়ন ফাটিয়া করুণার ধারা বাহির হইয়া পড়ে এবং নিজের সকল সামর্থ্য অকাতরে উৎসর্গ করিয়া তাহার দুঃখ দূর করিবার স্বতঃপরত চেষ্টা করেন। তা মানুষই কি আর জীবজন্তুই কি। এই সকল কারণে অজ্ঞাত কুলজাতি বাবাজীকে সেখানকার সকলেই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে

দেখিতেন এবং একটা কিছু বলিয়া তো ডাকিতে হইবে,—তাই তাঁহারই অভিমত 'দুনিয়া দাস' নামে তাঁহাকে অভিহিত করিতেন।

দুনিয়াদাসের দুইখানি কুটীর,—একখানি ছোট, একখানি বড়। ছোটখানির দ্বার সর্ব্বদাই রুদ্ধথাকিত, তাহার ভিতর কি আছে, বাবাজীই বা তাহার মধ্যে গমন করিয়া সাধন ভজন বা অন্যকিছু কি যে করিতেন, তাহা কেহ জানিত না। অন্যখানি সাধারণের জন্য—আর্ত্ত আতুরের নিমিত্ত সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। অনেক বিপন্ন ব্যক্তি সেই কুটীরের আশ্রয়ে থাকিয়া—বাবাজীর প্রাণ ঢালা শুশ্রূষায় প্রাণ পাইয়া—শুধু প্রাণ নয়,—প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটু নূতন কিছু পাইয়া চলিয়া গিয়াছে। আর আজ একদিন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মানন্দ তাঁহার সেই কুটীরে কাল যাপন করিতেছেন।

একাদশীর দিন মধ্যাহ্নের পর আহারান্তে ব্রহ্মানন্দ নৌকায় আরোহণ করেন। ঐ দিনই অপরাহ্নে তিনি পদ্মাজলে নিমজ্জিত হন, ঐ দিন রাত্রিকালেই তিনি জনৈক জেলিয়ার বৃহৎ জালে মৎস্যের সহিত তীরে উত্তোলিত হন। সন্ধ্যার পরেই ঝড় আসিয়া যায়। জেলিয়ারা জাল ছিঁড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি জাল তুলিয়া ফেলে, মাছের সঙ্গে মানুষ দেখিয়া অমঙ্গল আশঙ্কা করে এবং সংজ্ঞাহীন ব্রহ্মানন্দকে মড়া মনে করিয়া তীরে ফেলিয়া চলিয়া যায়।

দুনিয়াদাস বাবাজী প্রতি দিনই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নদীতে স্নান করিতেন। ঐ দিন ঘাটের নিকটে যাইতে তাঁহার পায়ে কি যেন একটা কি ঠেকিল। তখনও অন্ধকার আছে। বাবাজী হাত দিয়া দেখিলেন,—কি সর্ব্বনাশ।

এ যে মানুষ! আহা, আহা, কল্যকার অপরাহ্নিক ঝড়েই বোধ হয় বেচারার এই দশা করিয়াছে। বাবাজীর শরীর বল যেমন অসাধারণ, মানসবল আবার ততোধিক, ভয় কাহাকে বলে তিনি জানেন না। তিনি তাহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দেখিলেন, —সব ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। নাসার অগ্রে অনেকক্ষণ হাত রাখিয়াও ঠিক বুঝিতে পারিলেন না যে, নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে কি না? তাহার পর বক্ষের উপর কান রাখিয়া যেন অনেকক্ষণ পরে পরে একটু আধটু হৃদয়ের স্পন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তাঁহার আর স্নান করা হইল না। তিনি সেই শরীরটি দুবাহু দিয়া বক্ষের উপর তুলিয়া লইলেন এবং উঠিপড়ি করিয়া সেই বৃহৎ কুটীরে আনিয়া ফেলিলেন। সেই যে বাবাজী তাহাকে লইয়া পড়িলেন, আজ তিন চারিদিন অতীত হইতে চলিল। তাঁহার আর আহার নিদ্রা নাই। সর্ব্বদাই সেই বিপন্ন মানবটিকে লইয়া পড়িয়া আছেন। কুটীরের বাইরেও বড় যান, না যাহা খান, তাহা সেই রোগীরই আবশ্যকমত ঔষধ পথ্যাদির অনুরোধে। সে দিন রোগী বারংবার মুখব্যাদান করিতেছিল; বাবাজী মনে করিলেন—বুঝি তাহার আহারের স্পৃহা হইতেছে। কয়েক দিন অনেক চেষ্টাতেও দিবা-রাত্রে আধসেরের অধিক দুগ্ধ রোগীর গলাধঃকরণ করাইতে পারা যায় নাই; দেখি যদি এখন একটু অধিক পরিমাণে খাওয়াইতে পারি। এই ভাবেই তিনি অমানিসার তামস রাশি ভেদ করিয়া দুগ্ধের চেষ্টায় কুটীর হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। গোপগণ তাঁহাকে ভক্তি করিত সুতরাং দুগ্ধ সংগ্রহ করিতে কোন ক্লেশ পাইতে হইল না।

তিনি দুগ্ধ লইয়া প্রত্যাগমণ করিয়া দেখেন,—গৃহের দীপটি তৈল অভাবে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। ঠক্‌ঠক্‌ শব্দে পাছে রোগীর কোন কষ্ট হয়। সেই আশঙ্কায় তিনি কুটীরের দাওয়ায় বসিয়া চক্‌মকি ঠুকিয়া পাঁকাটিতে গন্ধক মাখানো দিয়াকাটি ঝরাইয়া তৈল দিয়া প্রদীপটি জ্বালিবার জোগার করিতেছেন ; এমন সময় তাঁহার কর্ণে ব্রহ্মানন্দের সেই "জয় মা তারা ব্রহ্মময়ী" রব প্রবেশ করিল। আনন্দে যেন তিনি এলাইয়া পড়িলেন। একে মানব, তার মায়ের উপাসক, আমার কুটীরে, অহো আমার কি সৌভাগ্য!—ভাবিয়া তিনি ভাবে বিভোর হইয়া উঠিলেন, এই অমারাত্রে আমার দুগ্ধ আনা সার্থক হইল। এখনই ইহাকে পান করাইতে পারিব, এ আনন্দ ও তাঁহাকে অল্প বিচলিত করিল না। তিনি তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া এক হস্তে দুগ্ধ পাত্র অপর হস্তে প্রজ্বলিত প্রদীপ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্রই ব্রহ্মানন্দের দৃষ্টি তাঁহার দিকে নিপতিত হইয়া গেল।

[৪]

ব্রহ্মানন্দ সেই অজানুলম্বিতবাহু শুভ্রকেশ শুভ্রশ্মশ্রু সৌমমূর্ত্তি বৈরাগীর দিকে তাকাইয়া দেখিতে দেখিতেই তিনি তাঁহার নিকটে গমন করিয়া স্নেহ মাখা স্বরে বলিলেন,—বাবা, একটু দুধ খাও।

আহা আহা, কি সুমিষ্ট স্বর গো! স্নেহময়ী জননীই যেন ঐ মূর্ত্তির আবরণে অঙ্গ আবরিয়া দুগ্ধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন! ব্রহ্মানন্দের প্রাণে তখনও সেই সারিগানের ধুয়াটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল,—কেবলই মনে হইতেছিল—যদি

দেখা পাই তারে,—যদি দেখা পাই তারে। এমন সময় বাবাজীর স্নেহামৃতসিক্ত স্বর তাঁহার কানের দ্বার অতিক্রম করিয়া প্রাণের ভিতর পঁহুছাইয়া গেল। তিনি মনে করিলেন,—কেন, এই তো দেখা পাইয়াছি, ঐ তো ঐ মূর্ত্তির মধ্যেই করুণাময়ী মা আমার বিরাজ করিতেছেন। বৈরাগ্যের কঠোর পাষাণ ভেদ করিয়া পাষাণ নন্দিনীরই তো ঐ কৃপামৃতের মন্দাকিনী ধারা ঝর ঝর বহিয়া আসিতেছে। তবে ইহাকে দুটো মনের কথা শুধাই না কেন?—এই ভাবিয়া তিনি বাবাজীকে কি যে কি বলিতে গেলেন; কিন্তু ঘনঘন ওষ্ঠাধর প্রকম্পিত হইতে হইতে তাঁহার মুখ দিয়া অপর কথা বাহির হইয়া, বাহিব হইয়া পড়িল,—"তারা ব্রহ্মময়ী।"

দুনিয়াদাস বাবাজীও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন,—"তারা ব্রহ্মময়ী। বাবা! একটু দুধ খাও! বাবা! একাদশীর শেষ-রাত্র হইতে তুমি অচৈতন্য আছ! আজ অমাবস্যা, চৈতন্যময়ীর কৃপায় এইমাত্র তোমার চৈতন্যের সঞ্চার হইয়াছে। একটু দুধ খাও বাপ আমার, দেখিয়া আমার আনন্দ হউক।"

ব্রহ্মানন্দ আবার একবার উঠিবার চেষ্টা করিলেন, ভাবিলেন,—উঠিয়া বসিয়া দুগ্ধ পান করি, কিন্তু তাহা পারিলেন না। শুইয়া শুইয়া মুখ হাঁ করিলেন। বাবাজীও তাঁহাকে দুগ্ধ পান করাইয়া আনন্দিত হইলেন।

এ কয়দিন রোগীকে অনেক চেষ্টায় দু ফোঁটা এক ফোঁটা করিয়া দুগ্ধ পান করানো চলিতে ছিল। আজ একেবারে চোঁ চোঁ করিয়া বড় নারিকেল মালার এক মালা—প্রায় তিন পোয়া দুগ্ধ পান করিতে দেখিয়া দুনিয়াদাসের আনন্দ হইল বটে—কিন্তু

ব্রহ্মানন্দ তাহাতে ক্লেশ অনুভব করিলেন। তাঁহার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। ভিতরে কেমন যেন হাঁপ ধরিতে লাগিল, ঘর্ম্মেরও উদগম হইল। তিনি আবার চক্ষু বুজিয়া স্থির হইয়া রহিলেন দেখিয়া বাবাজী তাঁহার অবস্থা বুঝিলেন। দাড়িতে হাত দিয়া স্নেহ সম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি বাবা, কিছু কষ্ট হইতেছে কি? ব্রহ্মানন্দ একটু সামলাইয়া লইয়া ক্ষীণ স্বরে বলিলেন,—না। এমন কিছু নয়।

এইবার উভয়ের ধীরে ধীরে কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল। দুনিয়াদাসের মুখে ব্রহ্মানন্দ নিজের সেই পদ্মাতীর হইতে আনয়ন প্রভৃতি সকল কথা জানিতে পারিলেন। দুনিয়াদাসও তাঁহার আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন।

আজ অমাবস্যা, এই কথা শুনিয়া অবধি ব্রহ্মানন্দের ভিতরটা বিষাদে ভরিয়া গিয়াছিল। হায়; অন্ধকার রজনী প্রভাত হইলেই সেই পবিত্র প্রতিপদ্ তিথির আরম্ভ,—কৌলিক প্রথা অনুসারে কল্য হইতেই আমাদের জগদম্বার কল্পারম্ভ। এবার আর আমার মায়ের পূজা ভাগ্যে ঘটিল না। এই কথা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

তাই বাবাজীর সহিত কথা কহিতে কহিতে তিনি মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক হইয়া যাইতে ছিলেন এবং থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে ছিলেন। বাবাজী তাঁহার ঐ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন,—আহা, স্ত্রী পুত্রাদির জন্যই বুঝি লোকটা বড়ই মর্ম্মযাতনা পাইতেছে। তাই তিনি তাঁহাকে প্রবোধবচনে বলিলেন,—ভয় কি বাবা ভয় কি? জগদম্বার কৃপায় তোমার

স্ত্রী পুত্রাদি তুমি নিশ্চয়ই লাভ করিবে। যে করুণাময়ীর করুণার হস্ত তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, সেই হস্তেই তোমার স্ত্রী পুত্রাদিকেও রক্ষা করিবেন। তজ্জন্য আর চিন্তা কিসের? উত্তরে ব্রহ্মানন্দ বলিলেন,—মহাভাগ, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করিবেন কিনা জানিনা। কিন্তু আমি আপনাকে সত্য কথাই বলিতেছি,—স্ত্রী পুত্রাদির জন্য আমার অন্তরে অণুমাত্রও চিন্তা নাই। স্ত্রী পুত্রাদি সঙ্গে আসে নাই,—যাইবে ও না, নিয়তি তাহাদের নিমিত্ত যে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই তাহাদিগকে উপভোগ করিতে হইবে। তজ্জন্য আমি আর ভাবিয়া করিব কি? তবে যতক্ষণ তাহারা আমার অধিকারে ছিল, কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা করিতে হইয়াছে। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় তাহারা এখন আমার অধিকার ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। এখন আর তাহাদের নিমিত্ত অকারণ চিন্তা করিয়া কি করিব? জগজ্জননী রাখিতে হয় রাখিবেন, মারিতে হয় মারিবেন। আমার চিন্তা,—একমাত্র চিন্তা, আগামী কল্য প্রতিপ্রদ—কল্যই মায়ের শুভ কল্পারম্ভ, বাটীতে থাকিলে নিজেই আমি কল্য হইতে মায়ের পূজায় নিযুক্ত থাকিতাম, কিন্তু এবার আর তাহা ভাগ্যে ঘটিল না।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বালকের মত উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, বাবাজী তাঁহার অবস্থা সকলই বুঝিলেন; বুঝাইবার জন্য বলিলেন,—কেন বাবা! এবার আর তোমার মায়ের পূজাই বা হইবে না কেন? তুমি মনোময়ীর মনে মনে পূজা কর না কেন বাবা,—তাহাতে আর বাধা কিসের? বলিতে বলিতে বাবাজী তাঁহার মধুর কণ্ঠে গান ধরিলেন।—

"মন! তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী বোলে বোস্‌রে ধ্যানে॥
জাঁক জমকে কোরলে পূজা
অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে কোর্‌বে পূজা
জান্‌বে না রে জগজ্জনে॥
ধাতু পাষাণ মাটীর মুর্ত্তি
কাজ কিরে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি
বসাও হৃদি পদ্মাসনে॥
আলোচাল আর পাকাকলা
কাজ কিরে তোর আয়োজনে।
তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তাঁরে
তৃপ্ত কর আপন মনে॥
ঝাড় লণ্ঠন বাতীর আলো
কাজ কিরে তোর রোস্‌নায়ে॥
তুমি মনোময় মানিক্য জ্বেলে
দেওয়া জ্বলুক নিশিদিনে॥
মেষ ছাগল মহিষাদি
কাজ কিরে তোর বলিদানে॥
তুমি জয় কালি জয় কালি বোলে
বলিদাও ষড়রিপুগণে॥

প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল
কাজ কিরে তোর সে বাজনে ॥
তুমি জয় কালি বলি দেও করতালি
মন রাখ সেই শ্রীচরণে" ॥

বাবাজীর গান গাওয়া শেষ হইয়া গেল, গানের সুরে ঘরটা যেন গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল। শুধু বাহিরের ঘরটা নয়, ব্রহ্মানন্দের ভিতরের ঘরটাও সে সুরে ভরপুর হইয়া গেল। তিনি যেন এক নূতন অবলম্বন পাইলেন। নয়নহীন অন্ধ যেমন অচেনা পথে হাতড়াইতে হাতড়াইতে একজন চক্ষুষ্মাণের পর সহায়তা পাইল। এতক্ষণে তাঁহার দুর্ভাবনা দূর হইল,—চঞ্চল চিত্ত স্থির হইল। তিনি বাবাজীকে বিনয় বচনে বিদায় দিয়া মনে মনে মায়ের মনোময়ী প্রতিমা গড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কুটীরের বাহিরে আসিয়া বাবাজী দেখিলেন,—পূর্ব্ব গগনে শুভতারা উঠিয়াছে ; অরুণ উদয়ের আর বিলম্ব নাই। কয়েকদিন স্নান তো হয়ই নাই—ক্ষুদ্র কুটীরের নিয়মিত কৃত্য ও হইয়া উঠে নাই, আজ একটু সকাল সকাল স্নান করিয়া আসি, মনে করিয়া তিনি বরাবর নদী তীরে গমন করিলেন।

এদিকে ব্রহ্মানন্দ মনে মনে আনন্দময়ীর দালান আলো করা দিব্যমূর্ত্তি গড়িলেন। রং মাখাইলেন, চাল চিত্র করিলেন ; মনের মত কত সাজে সাজাইলেন। সাজাইতে সাজাইতে এক একবার মায়ের মুখখানি দেখেন, আর আনন্দে আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন। ভাবেন,—আহা আহা, মায়ের আমার কি অপরূপ মাধুরী রে! ভাবিতে ভাবিতে কিছুক্ষণ যেন আপনার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া

ফেলেন, আবার আপনার অস্তিত্ব ও এক আধবার খুঁজিয়া পান। ফলে হইল কি, সেই সময় হইতে ব্রহ্মানন্দের নিকটে—কেবলই মা, কিংবা মা ও তিনি ছাড়া আর কিছুই রহিল না। এই ভাবেই তাঁহার অমানিশার অবসান হইয়া গেল।

ব্রহ্মানন্দ আজ একাই কুম্ভকার, একাই চিত্রকর, একাই মালাকার,—একাই সব, মা-ও কি ব্রহ্মানন্দ ছাড়া? ব্রহ্মানন্দ আজ পূজক হইয়াও পূজার প্রতিমা!—আপনিই তিনি মা হইয়া বসিয়াছেন!

প্রতিপদের প্রাতঃকালেই তিনি মনে মনে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক কল্পারম্ভের আয়োজন করিয়া লইলেন। সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন পূর্ব্বক উত্তর মুখে উপবেশন করিয়া যথাবিধি স্বস্তিবাচন ও পূজার সঙ্কল্প করিলেন। তাহার পর সঙ্কল্প সূক্তাদি পাঠপূর্ব্বক চণ্ডীপাঠ এবং দুর্গানাম মধুসূদন নাম জপের সঙ্কল্প করিয়া ফেলিলেন।

সঙ্কল্পের মধ্যে কামনা রহিল—ভগবতী দুর্গারই প্রীতি। তৎপরে তিনি চণ্ডীর ঘট স্থাপন পূর্ব্বক নানা উপচারে দেবীর পূজাও চণ্ডী-পাঠাদি করিতে লাগিলেন।

প্রতিপদ হইতে ষষ্ঠী পর্য্যন্ত প্রতিদিনই এইভাবে পূজা পাঠ চলিতে লাগিল; বিশেষের মধ্যে তিনি দেবীকে প্রতিপদে চিরুণী ও গন্ধদ্রব্য সমন্বিত মাথাঘষা প্রভৃতি, দ্বিতীয়ায় কেশ বন্ধনের পট্টডোরী: তৃতীয়ায় ভূষনার্থ আলতা দর্পণ সিন্দুর প্রভৃতি। চতুর্থীতে কজ্জল, মধুপর্ক, রৌপ্যনির্ম্মিত তিলকাদি এবং পঞ্চমীতে মাখিবার জন্য চন্দন ও পুষ্পমাল্য নিবেদন করিয়া দিলেন। ষষ্ঠীর

দিন বেলাবেলী নবপত্রিকা বাঁধিয়া লইলেন, তারপর সায়ংকৃত্য সমাপনান্তে তিনি বিল্ববৃক্ষ সমীপে গমন করিয়া দেবীর বোধন করিতে বসিলেন। স্বস্তিবাচন সঙ্কল্পাদি পূর্ব্বক সেখানে ঘটস্থাপনা করা হইল। তিনি "জটাজুটসমাযুক্তাং" ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন। তদনন্তর তিনি বিল্ববৃক্ষের পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে দেবীর বোধন মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা॥
অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বদ্ বোধয়ামি সুরেশ্বরি।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষায় বরদা ভব শোভনে॥
শক্রেন সম্বোধ্য স্বরাজ্যমাপ্তং,
তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি।
যথৈব রামেণ হতো দশাস্য—
স্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি॥
দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডবিগ্রহ কারিণি।
বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্যতিষ্ঠ দেবি যথাসুখম্॥"

তাহার পর তিনি ঘটের চারিকোণে চারিটি তীর পুঁতিয়া লাল সূতা দিয়া বেষ্টন করিয়া দিলেন। তদনন্তর অধিবাসের আয়োজন করিয়া লইয়া সঙ্কল্প পূজাদি সমাপন পূর্ব্বক বিল্ববৃক্ষের একটি শাখায় সিন্দুর মাখাইয়া দিয়া প্রতিমার নিকটে আসিলেন। প্রতিমার অধিবাসও হইয়া গেল। তিনি প্রতিমার চারিকোণে চারিটি তীর প্রোথিত করিয়া আরতি করিলেন। ঢাক ঢোল জগঝম্প কাড়া

নাগরা প্রভৃতি বাজনা তালে তালে বাজিয়া উঠিল। বালক বালিকারা বাজনার সহিত নাচ জুড়িয়া দিল, ধূপ ধূনার ধূমে চণ্ডীমণ্ডপ অন্ধকার হইয়া গেল। মায়ের চরণ হইতে আরতি প্রদীপটি যখন মুখের দিকে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতে থাকে, তখন কি এক জ্যোতি যেন তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে ভূষণে ভূষণে খেলিয়া বেড়ায়; তা দেখিয়া ব্রহ্মানন্দের নয়ন মন ভুলিয়া যায়। সে শোভা যেন দেখিয়াও সাধ মিটে না।

[৬]

ব্রহ্মানন্দ ষষ্ঠীর রাত্রি গীত বাদ্যাদি উৎসব করিয়া অতিবাহিত করিলেন। সপ্তমীর প্রাতঃকালে স্নান প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করিয়া বাদ্যোদ্যম সহকারে বিল্ববৃক্ষের সমীপে গমন করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা পূজাদি করিয়া সেই সিন্দুর চিহ্নিত শাখাটী ছেদন পূর্ব্বক প্রতিমার নিকটে আনয়ন করিলেন। তাহার পর নবপত্রিকাকে স্নান করাইয়া বসনভূষণ পরাইয়া গণেশের দক্ষিণপার্শ্বে পৃথক বেদীতে রাখিয়া দিলেন। তৎপরে পূজার আসনে বসিয়া ভূতাপসারণ করিয়া নবপত্রিকা প্রবেশ, প্রতিমার চক্ষুদান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক ঘটস্থাপন করিলেন। দেবীর সম্মুখে একটী এবং গণেশের সম্মুখে আর একটি ঘট স্থাপিত হইল। তিনি নাস্যাদি করিয়া জগজ্জননীর পূজায় বসিয়া গেলেন। তিনি দেবীর ধ্যান করিয়া আবাহন করিতে লাগিলেন,—মাগো! তুমি তোমার অষ্টশক্তি সমভিব্যাহারে আমার গৃহে আগমন কর মা? সর্ব্বকল্যাণকারিনি! তুমি কৃপা করিয়া আমার পূজা অঙ্গীকার কর মা।

অয়ি কমলনয়না মা আমার। আমি তোমার শারদীয়া মহাপূজা করিবার বাসনা করিয়াছি। তাহাতে অনুমতি দাও মা। দৈত্য দর্পদলনি মহাদেবী মা আমার! তুমি সর্ব্ববিধ অশুভ বিনাশ পূর্ব্বক অপার সংসার সাগর পার করিয়া থাক, শঙ্করি! আমাকেও তাহা হইতে পরিত্রাণ কর মা! সর্ব্বরক্ষা করি পরমেশ্বরি মা আমার! তুমি আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া তোমার একান্ত অনুগত কর মা! আর মাগো! আমি যতক্ষণ তোমার পূজা করিব, ততক্ষণ দেবগণের সহিত এই বিল্বশাখা আশ্রয় করিয়া নিশ্চল ভাবে অবস্থান কর মা! করুণাময়ি! তোমার চরণে ধরিয়া বলি, আমার অনুরোধ রাখিয়া অষ্টশক্তির সহিত আমার পূজা স্বীকার কর মা! স্বীকার কর।"

ব্রহ্মানন্দ এইরূপ কত কি বলিতে বলিতে নয়ন জলে বদন ভাসাইতে ভাসাইতে মায়ের আবাহন করিলেন। তাহার পর ষোড়শ উপচারে দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন। পূজা সমাপ্ত হইয়া গেলে তিনি মায়ের উদ্দেশ্যে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া তৈজসধার অন্নজল বস্ত্র এবং ভোজ্যাদি উৎসর্গ করিলেন। তৎপরে প্রাণায়াম করিতে করিতে জপ করিতে লাগিলেন। আবার প্রাণা-য়াম করিয়া "গুহ্যাতিগুহ্য" মন্ত্রে জপ সমর্পন করিলেন। তাহার পর তিনি দেবীর আবরণ পূজা ও নবপত্রিকা পূজা সমাপন পূর্ব্বক মহিষাসুরাদির পূজা সারিয়া শ্রীদুর্গা মন্ত্র জপ ও চণ্ডীপাঠান্তে দেবীকে নানাবিধ ভোগ নিবেদন করিয়া দিলেন। অবকাশমত সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কন এবং যথাকালে আরত্রিকাদি সম্পন্ন করিয়া নৃত্যগীত বাদ্যে নিশার অবসান করিলেন।

অষ্টমীর দিন প্রাতে আবার স্নানাদি করিয়া অষ্টমী বিহিত পূজা, চতুঃষষ্টি যোগিনীর পূজা এবং সন্ধি পূজা প্রভৃতির যথাবিধি অনুষ্ঠানে পরমানন্দে তাঁহার দিবারাত্রি কাটিয়া গেল। নবমীর দিনও তিনি ঐরূপ প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া নবমীবিহিত পূজা আনন্দে আনন্দেই শেষ করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর তিনি যথাবিধি অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক ঘৃতাক্ত বিল্বপত্রে হোম করিতে লাগিলেন। হোমের হুতাশন ভক্তির আহুতি পাইয়া দক্ষিণাবর্ত্ত ভাবে দাউ দাউ জ্বলিতে লাগিল। তাহার পবিত্র গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিল। হোমের পর তিলকদান কার্য্য ও সমাহিত হইল। এইবার দেবীকে দক্ষিণা দিতে হইবে : ব্রহ্মানন্দের আনন্দের জমাটি একেবারে কমজোর হইয়া পড়িল। অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে তিনি দেবীকে দক্ষিণা দান করিলেন। ইহার পর হইতেই যেন তিনি কেমন একরকম হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মন এইবার দেবীর আরাধনা ছাড়িয়া দেহের দিকে চলিয়া পড়িল। তাঁহার সুখের স্বপ্ন ও ভাঙ্গিয়া গেল।. তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন,—দুনিয়াদাস বাবাজী তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া একতারা বাজাইয়া ভজন গাহিতেছেন।

[৭]

প্রতিপদ হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত ক'এক দিন ব্রহ্মানন্দ আবিষ্ট আবিষ্ট অবস্থাতেই ছিলেন। আহারাদির অনুসন্ধানেই ছিল না, কিন্তু দুনিয়াদাস সর্ব্বদা তাঁহার তদ্বির করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে যতটুকু পারেন, তাঁহাকে দুগ্ধ পান করাইতেন। এ কয়দিন অবশ্য তিনি দুগ্ধ বড় মন্দ খান নাই। প্রতিদিন গড়ে দুইসের

হইবে। মাতাল যেমন নেশায় মজগুল হইয়াই থাকে,—খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার বড় বুঝিতে পারে না, মাতৃ মদিরার নেশায় বুঁদ ব্রহ্মানন্দ ও তেমনি এ আহারের কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই। এইবার তাঁহার সে নেশা ছুটিয়া গিয়াছে, তাই আহারের কথা মনে পড়িল।

তিনি আবিষ্ট অবস্থায় থাকুন, কিন্তু এ কয় দিনে তাঁহার দেহের বল অনেক বাড়িয়া গিয়াছে,—শরীরের বেদনা ও চলিয়া গিয়াছে। তিনি সুপ্তোত্থিতের মত উঠিয়া বসিলেন। বসিতে কোন কষ্টই হইল না, বসিয়াই ছুনিয়াদাসকে বলিলেন,—মহাশয়! বেজায় ক্ষুধা, কিছু খাইতে দিতে পারেন কি?

ব্রহ্মানন্দের কথা শুনিয়া বাবাজীর বড় আনন্দ হইল। তিনি স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন,—হুঁ, আছে বই কি, ফল মূল মিষ্টান্ন মায়ের প্রসাদ কত কি আছে, আজ এখানকার জমিদার বাড়ী হইতে মহানবমীর এই সমস্ত প্রসাদ পাওয়া গিয়াছে। এই দেখ, ইহার মধ্যে কি খাইতে ইচ্ছা, খাও না বাবা!

মহানবমীর দিন মায়ের প্রসাদ লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দের আনন্দ আর ধরে না। তিনি সেই প্রসাদ প্রচুর পরিমাণে পাইয়া পরম প্রীতি অনুভব করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল,—যদি নিকটে হয়তো জমাদার বাটী গিয়া একবার জগদম্বাকে প্রণাম করিয়া আসি। বাবাজীকে মনের কথা খুলিয়াও বলিলেন, কিন্তু অনেকটা দূর বলিয়া বাবাজী তাহাতে সম্মত হইলেন না,—আগামী-কল্য নদী তীরে প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখাইতে লইয়া যাইবেন বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন।

'বিসর্জ্জন' কথাটা ব্রহ্মানন্দের কাণে ও প্রাণে কেমন খ্যাঁচ করিয়া উঠিল। তিনি "আচ্ছা তাহাই হইবে" বলিয়া বিষণ্ণ মনে বসিয়া রহিলেন। সেদিন বাবাজীর আর ভজন গানের বিরাম নাই। সেই গান শুনিতে শুনিতে ব্রহ্মানন্দের প্রাণটা অনেক ঠাণ্ডা হইল। কয়দিন অবিশ্রান্ত শয্যায় পড়িয়া থাকায় আজ আর তাঁহার শয্যার ত্রিসীমা মাড়াইতে ইচ্ছা হইতে ছিল না, তিনি দিয়ালে ঠেস দিয়া দাওয়ায় বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

এইরূপে তাঁহার নবমীর নিশি প্রভাতা হইয়া গেল আজ আর ব্রহ্মানন্দের অন্তরে বিন্দুমাত্র আনন্দ নাই। তিনি সেদিন দিবাভাগে কিছু আহারই করিলেন না। দুনিয়াদাস আহারের নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া খাওয়ার কথা বলিলেন,—বাবা! ঐ মায়ের প্রসাদী মুড়কিগুলি দুগ্ধ কদলী দিয়া মাখিয়া আহার কর, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ— "দেহটা ভাল নাই,—ক্ষুধার উদ্রেক নাই" প্রভৃতি বলিয়া কিছুতেই আহার করিলেন না।

অপরাহ্ণ হইল। বিসর্জ্জনের বাজনার আওয়াজ পাইয়া বাবাজী ব্রহ্মানন্দকে লইয়া নদীতীরে আসিলেন। প্রতিমা দর্শনের প্রতীক্ষায় এক উচ্চ চরের উপর উভয়ে বসিয়া আছেন। তীরের ধারে ধারে শতশত তরণীর ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ একখানি তরীর ভিতর হইতে বালক কণ্ঠে কে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—মা! মা!—ঐ যে বাবা একটু বুড়োর সঙ্গে বোসে রোয়েচে।

এই শব্দ শুনিয়া ব্রহ্মানন্দ চমকিয়া উঠিলেন। কার এ কণ্ঠস্বর?—শিবানন্দের মতন না?—হায়। জগদম্বা কি বাছাকে

জীবিত রাখিয়াছেন ? এই ভাবিয়া তিনি তাড়াতাড়ি নৌকার দিকে তাকাইয়া দেখেন,—কি আশ্চর্য্য ! এ যে সেই নৌকা, সেই নাবিক, সে-ই সব! কি আশ্চর্য্য! ঐ যে ভৃত্য রামকান্ত ও নৌকার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে! আরে, আরও কি আশ্চর্য্য! ঐ যে শিবানন্দের প্রসূতি ও শিবানন্দকে কোলে লইয়া নৌকার গবাক্ষ দিয়া দেবী দর্শনের বাসনায় বসিয়া আছেন! কি আশ্চর্য কি আশ্চর্য!—এ কি স্বপ্ন, না সত্য ?

বালকের বারংবার চীৎকারে ব্রহ্মানন্দের মনে সন্দেহ বড় বেশীক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিল না। তিনি হর্ষভাবে উচ্চ ডাক দিলেন,—বাবা শিবানন্দ !

শিবানন্দ বলিল,—বাবা ! বাবা ! এইবার সকলেরই পরস্পর নয়নে নয়নে মিলন হইয়া গেল ! শিবানন্দের মাতা মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া জানালার অন্তরালে গমন করিলেন। শিবানন্দ তা শুনিবে কেন ? তার আর ত্বরা সয় না। সে বাবার কাছে যাবার জন্য মহা তুলস্থুল বাধাইয়া দিল। ব্যাপার বুঝিতে বাবাজীর বড় বিলম্ব হইল না: তিনি ব্রহ্মানন্দকে লইয়া নৌকায় গমন করিলেন। আনন্দ হল হলায় তরী যেন উৎসবময় হইয়া উঠিল। ব্রহ্মানন্দ তাঁহার জীবনরক্ষার বিবরণ সংক্ষেপে শুনাইয়া দিয়া রামকান্তের কাছে তাহাদের বিবরণ আদায় করিয়া লইলেন। শুনিলেন,—এক ঘূর্ণাবায়ু ও বেগবান্ তরঙ্গের সাহায্যে তরণী সমেত তাহারা তীর ভূমি লাভ করে। দয়াময়ী মাই যেন বায়ু ও তরঙ্গ রূপ উভয় বাহু বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে তীরে রাখিয়া যান। বিশেষ আঘাত কাহারও কিছুই লাগে নাই। কেবল

অতিরিক্ত জল খাইয়া ফেলায় শিবানন্দের অবস্থা একটু আশঙ্কা-জনক হইয়াছিল। এক সজ্জনের সাহায্যে তাহারা নদী তীরবর্ত্তী একটি বৃহৎ বাটীতে থাকিয়া শিবানন্দকে সুস্থ করিয়া আজ বিজয়া দশমীতে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। তরীখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সেখানি মেরামত করিতেও কিছু সময় গিয়াছে।

তাঁহাদের পরস্পর কথাবার্ত্তা হইতে হইতে জমিদার বাটীর প্রতিমা মহাসমারোহে আসিয়া গেলেন। প্রতিমাকে একজোড়া নৌকার মাঝখানে চাপাইয়া কিছুক্ষণ বাচ খেলাইয়া লইয়া বেড়ানো হইল। নৌকায় নৌকায় রঙ্গ-রসের ছড়াছড়ি। দিকে দিকে দর্শকের হুড়াহুড়ি। এইবার দুখানি নৌকা দুইধারে সরিয়া গেল। আর মধ্য হইতে দেবীপ্রতিমা জলমধ্যে নিমজ্জিত হইলেন।

সমস্ত বাজনা অমনি সমতালে বাজিয়া উঠিল। হরি হরি রোলে বিশ্বব্যোম পূর্ণ হইয়া গেল।

বিজয়ার বিসর্জ্জনের পর শান্তিজল। তারপর কোলাকুলি, তাহার পর মিষ্টি মুখ। ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির শান্তিজল হইল—নেত্রনির্গত মিলনের শীতল সলিলে। তারপর শিবানন্দ যখন তাহার মায়ের মনটিকে সঙ্গে লইয়া "বাবা! বাবা!" বলিয়া ব্রহ্মানন্দের কোলে ঝাঁপাইয়া আসিল, তখনই তাঁহাদের বিজয়ার কোলাকুলি হইয়া গেল। তবে মিষ্টমুখটা হইল বাবাজীর কুটীরে। বাবাজীর স্নেহমাখা অনুরোধ তাঁহারা কেহই এড়াইতে পারিলেন না। বাবাজীর কিন্তু তাঁহার মিষ্টান্নব্যয়টা শিবানন্দের হাসিমাখা মুখখানির নিকট হইতেই সুদ সমেত আদায় করিয়া লইলেন। ওঃ, সে চুমা খাইবার ধুম ছাখে কে?

হুনিয়াদাসের আবাসে তাঁহারা আনন্দে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন আহারান্তে "জয় মা তারা ব্রহ্মময়ী" করে দিগবলয় কাঁপাইতে কাঁপাইতে দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

* * *

মা আমার দুঃখ দিতেও যেমন, দুঃখ দূর করিতেও তেমনই। মা আমার 'দুর্গতি হারিণী' নাম সার্থক করিবার নিমিত্তই বোধ হয় জগতে এত দুর্গতি বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন? মনের কথা,—জীব, তুমি আমাকে আশ্রয় কর। প্রতিকর্ম্মে আমার নাম লইয়া নিযুক্ত হও, আর তোমার ভয় নাই,—তোমার দুঃখ দুর্গতি আমিই দূর করিয়া দিব। বলি হাঁ মা, তাই-ই কি? তোর মনের কথা তুই-ই জানিস, আমরা তার কি জানিব বল।

তবে মনে হয়,—এ দুঃখ দিয়া দুঃখ দূর করিবার বাহাদুরিটা যেন না দেখাইলেই ভাল হইত। না হয় তোর দুঃখহারিণী দুর্গতি নাশিনী বিপদভঞ্জিনী গোছের দুই দশটা নাম তোর অনন্ত নামের মধ্য হইতে বাদ যাইত। তাহাতেই বা ক্ষতি ছিল কি? অবশিষ্ট নামে ডাকিলে কি আর মা তোকে ডাকা হইত না? হয়তো বলিবি :—

"সুখংহি দুঃখান্যনুভূয় শোভয়ে
ঘনান্ধকারেষ্বির দীপদর্শনম্॥"

দুঃখের নিবিড় আঁধার না কাটিলে সুখের আলো ভালো খোলে না। তাই আগে আগে এই দুঃখ দেখানো? মা! তোর ঐ ছেলে ভুলানো কথায় আমরা ভুলিতে চাই না। দুঃখ দিবার মালিক

একজন, আর সুখ দিবার মালিক আর একজন যদি কেহ থাকিত, তবে না হয় ও কথা একদিন মানিয়া লইতে পারিতাম। তাই অনেক সময় মনে হয়,—কেতাবে পণ্ডিতদের মত খেতাবের লোভটা বুঝি ও অন্তরে উঁকিঝুঁকি মারে? তা তোর মনে মা! যাহা হইবার তাহাই হউক। কুটীরের কাঙাল আমাদের ও রাজা বাজোয়াড়ার খবরে দরকার নাই। কেবল আর্শীবাদ কর মা?— আমাদের রসনা যেন স্ববশে থাকে আর যখন তখন তোকে ডাকিতে পারে,—জয় মা তারা ব্রহ্মময়ী!—জয় মা তারা ব্রহ্মময়ী! —জয় মা তারা ব্রহ্মময়ী!

—০—

(১৩২০ সাল-এর পূজারগল্প গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।)

পুরাতনী বিচিত্রা

(৫)

'এদেশে একটা প্রচলিত কথা আছে, আনন্দময়ীর আগমনে কেউ নিরানন্দ থাকে না। তার কারণ যে ব্যক্তি গত দুঃখের বোঝা হাটে নামিয়ে কেহই জাতীয় আনন্দোৎসবে নিরানন্দের সৃষ্টি করতে চায় না।

অমৃত লাল বসু

১৩৩০ মাসিক বসুমতী (পুর্ণমুদ্রিত) থেকে গৃহীত

দুর্গোৎসব্

(১)

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পহেলাপর্ব—নিমন্ত্রণ পত্র

বর্ষা গেল, ফর্শা হোয়ে, নদীতে নাই বান।
রোদের চোটে, মাটী ফাটে, মাঠে নাইকো ধান॥
সকাল বিকাল, শুকো অকাল, চাষা ভেবে মলো।
হেসে, হেসে, শরৎ এসে, দেশে উদয় হোলো॥
বাবু ভেয়ে, ছুটি পেয়ে দুগ্‌গো মায়ের গুণে।
নতুন শাড়ী, নিয়ে বাড়ী, যাচ্ছে রেতে দিনে॥
দুগ্‌গো পরব, দেশের গরব, বজায় থাকা ভালো।
লায়েক মুক্ষু, ভোলে দুক্ষু, পেয়ে সুখের আলো॥
কিন্তু হেথা, খেদের কথা, পুতুল খেলা নিয়ে।
ঘরে ঘরে, বিবাদ কোরে, ফাটায় দেশের হিয়ে॥
পরব করো, মজা মারো, দেশের পানে চাও।
বেদ কোরাণে, বিবাদ কেনে, এক কাট্টা হও॥
ছিষ্টি ছাড়া, ঠাকুর গড়া, তিন চোকো দশ হতে।
সবাই যখন, সত্য এখন, কষ্কে পায় কি এতে ?

ছেড়ে ছুড়ে, মুল্লুক যুড়ে এমন তরো করো।
সবাই যাতে, হাতে হাতে সগ্‌গ পেতে পারো॥
আসল শক্তি, যাবে ভক্তি, সকল লোকে করে।
তার চেহারা, দেখ খাড়া, ঐ আছে উপরে॥
সকল ধর্ম্ম, হিঁদু, বেহ্ম, নেড়ে কেরেস্তান।
ওই মূর্ত্তি, পূজে ফুর্ত্তি, সবাই এখন পান॥
মোরা কজন, ওনার ভজন, কোরে পেয়েছি পদ।
বিমুখ যারা, ঠকে তারা, তাদেবি বিপদ।
শক্তি সেবা, কোত্তে যেবা, আছ অভিলাষী।
চিন কি অচিন, পূজোর কাদন, মোদের বাড়ী আসি॥
হাজির হবা, সবান্ধবা, আরোজ রাশি রাশি

ইতি তারিখ ২০শে শেতাম্বর হিজরী, সন ১৩০২ সাল { শ্রী আরে-দূর রহমান (১)। শ্রী কায়েম-বানরজী (২)। শ্রী মহিষ নয় রত্ন (৩)।

সর্ব্ব মোকাম পূজোর দালান।

* পাঁচুঠাকুর গ্রন্থ হতে সংগৃহীত।

———

দুর্গোৎসব

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১

বর্ষে বর্ষে এসো যাও এ বাঙ্গলা ধামে
কে তুমি ষোড়শী কন্যা, মৃগেন্দ্রবাহিনি ?
চিনিয়াছি তোরে দুর্গে, তুমি নাকি ভব দুর্গে,
দুর্গতির একমাত্র সংহারকারিণী ॥
মাটি দিয়ে গড়িয়াছি, কত গেল খড় কাছি,
সৃজিবারে জগতের সৃজনকারিণী।
গড়ে পিটে হলো খাড়া, বাজা ভাই ঢোল কাড়া,
কুমারের হাতে গড়া ঐ দীনতারিণী ?
বাজা—ঠমকি ঠমকি ঠিকি, খিনিকি
ঝিনিকি ঠিনি ॥

২

কি সাজ সেজেছ মাতা রাঙ্গতার সাজে।
এ দেশে যে রাঙ্গই সাজ কে তোরে শিখালে ?
সন্তানে রাঙ্গতা দিলে আপনি তাই পরিলে,
কেন মা রাঙ্গের সাজে এ বঙ্গ ভুলালে ?

ভারত রতন খনি, রতন কাঞ্চন মণি,

সে কালে এদেশে মাতা, কত না ছড়ালে ?

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, আজি তুমি রাঙ্গতা পরা,

ছেঁড়া ধুতি রিপু করা, ছেলের কপালে ?

তবে—বাজা ভাই ঢোল কাঁশি মধুর

খেমটা তালে ॥

৩

কারে মা এনেছ সঙ্গে, অনন্তরঙ্গিণি !

কি শোভা হয়েছে আজি, দেখ রে সবার !

আমি বেটা লক্ষ্মীছাড়া, আমার ঘরে লক্ষ্মী খাড়া,

ঘরে হতে খাই তাড়া, ঘরখরচ নাই ॥

হয়েছিল হাতে খড়ি, ছাপার কাগজ পড়ি,

সরস্বতী তাড়াতাড়ি, এলে বুঝি তাই ?

করো না মা বাড়াবাড়ি, তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি,

চড়ে না ভাতের হাঁড়ি, বিদ্যায় কাজ নাই ।

তাক্ তাক্ ধিনাক্ ধিনাক্ বাজনা

বাজা রে ভাই ॥

৪

দশ ভুজে দশায়ুধ কেন মাতা ধর ?

কেন মাতা চাপিয়াছ সিংহটার ঘাড়ে ?

ছুরি দেখে ভয় পাই, ঢাল খাঁড়া কাজ নাই,

ও সব রাখুক গিয়ে রামদীন পাঁড়ে ।

সিংহ চড়া ভাল নয়, দাঁত দেখে পাই ভয়,
প্রাণ যেন খাবি খায়, পাছে লাফ ছাড়ে,
আছে ঘরে বাঁধা গাই, চড়তে হয় চড় তাই,
তাও কিছু ভয় পাই পাছে সিঙ্গ নাড়ে।
সিংহপৃষ্ঠে মেয়ের পা! দেখে কাঁপি
হাড়ে হাড়ে ॥

৫

তোমার বাপের কাঁধে—নগেন্দ্রের ঘাড়ে
তুঙ্গ শৃঙ্গোপরে সিংহ—দেখ গিরিবালে।
শিমলা পাহাড়ে ধ্বজা, উড়ায় করিয়া মজা,
পিতৃ সহ বন্দী আছ, হর্য্যক্ষের জালে।
তুমি যারে কৃপা কর, সেই হয় ভাগ্যধর—
সিংহেরে চরণ দিয়ে কতই বাড়ালে!
জনমি ব্রাহ্মণ কুলে, শতদল পদ্ম তুলে
আমি পূজে পাদপদ্ম পড়িনু আড়ালে!
রুটি মাখন খাব মা গো! আলোচাল ছাড়ালে!

৬

এই শুন পুনঃ বাজে মজাইয়া মন,
সিংহের গভীর কণ্ঠ, ইংরেজ কামান।
হুড়ুম হুড়ুম হুম, প্রভাতে ভাঙ্গায় ঘুম,
দুপুরে প্রদোষে ডাকে, শিহরয় প্রাণ।

ছেড়ে ফেলে ছেঁড়া ধুতি, জলে ফেলে খুঙ্গী পুঁথি ;
সাহেব সাজিব আজ ব্রাহ্মণ সন্তান।
লুচি মণ্ডার মুখে ছাই, মেজে বস্যে মটন খাই,
দেখি মা পাই না পাই তোমার সন্ধান।
সোলা-টুপি মাথায় দিয়ে পাব জগতে সম্মান॥

৭

এনেছ মা বিঘ্ন-হরে কিসের কারণে ?
বিঘ্নময় এ বাঙ্গালা, তা কি আছে মনে ?
এনেছ মা শক্তি-ধরে, দেখি কত শক্তি ধরে ?
মেরেছে মা বারে বারে দুষ্টাসুরগণে,
মেরেছ তারকাসুর, আজি বঙ্গ ক্ষুধাতুর,
মার দেখি ক্ষুধাসুর, সমাজের রণে ?
অসুরে করিয়া ফের, মায়ে পোয়ে মার্‌লে ঢের,
মার দেখি এ অসুরে, ধরি ও চরণে॥
তখন—"কত নাচ গো রণে!" বাজাব
প্রফুল্ল মনে॥

৮

তোমার মহিমা মাতা বুঝিতে নারিনু,
কিসের লাগিয়া আন কাল বিষধরে ?
ঘরে পরে বিষধর, বিষে বঙ্গ জর জর
আবার এ অজগর দেখাও কিস্করে ?

হই মা পরের দাস, বাঁধি আঁটি কেটে ঘাস,
নাহিক ছাড়ি নিশ্বাস কালসাপ ভরে।
নিতি নিতি অপমান, বিষে জর জর প্রাণ,
কত বিষ কণ্ঠ মাঝে, নীলকণ্ঠ ধরে ;
বিষের জ্বালায় সদা প্রাণ ছটফট করে।

৯

দুর্গা দুর্গা বল ভাই দুর্গাপূজা এলো,
পুঁতিয়া কলার তেড় সাজাও তোরণ।
বেছে বেছে তোল ফুল, সাজাব ও পদমূল,
এবার হৃদয় খুলে পূজিব চরণ॥
বাজা ভাই ঢাক ঢোল, কাড়া নাগড়া গণ্ডগোল,
দেব ভাই পাঁটার ঝোল, সোনার বরণ॥
ন্যায়রত্ন এসো সাজি, প্রতিপদ হল আজি,
জাগাও দেখি চণ্ডীরে বসায়ে বোধন ?

১০

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু—ছায়া রূপ ধরে।
কি পুঁথি পড়িলে বিপ্র! কাঁদিল হৃদয়!
সর্ব্বভূতে সেই ছায়া! হইল পবিত্র কায়া,
ঘুচিবে সংসার মায়া, যদি তাই হয়॥
আবার কি শুনি কথা! শক্তি নাকি যথা তথা?
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু, শক্তিরূপে রয়?

বাঙ্গালি ভূতের দেহ— শক্তিত না দেখে কেহ ;
ছিলে যদি শক্তিরূপে, কেন হলে লয় ?
আদ্যাশক্তি শক্তি দেহ ! জয় মা চণ্ডীর জয় !

১১

পরিল এ বঙ্গবাসী, নূতন বসন,
জীবন্ত কুসুমসজ্জা, যেন বা ধরায়।
কেহ বা আপনি পরে, কেহ বা পরায় পরে,
যে যাহারে ভালবাসে, সে তারে সাজায়।
বাজারেতে হুড়াহুড়ি, আপিসেতে তাড়াতাড়ি
লুচি মণ্ডা ছড়াছড়ি ভাত কেবা খায় ?
সুখের বড় বাড়াবাড়ি টাকার বেলা ভাঁড়াভাঁড়ি,
এই দশা ত সকল বাড়ী, দোষিব বা কায় ?
বর্ষে বর্ষে ভুগি মা গো, বড়ই টাকার দায়।

১২

হাহাকার বঙ্গদেশে, টাকার জ্বালায়।
তুমি এলে শুভঙ্করি ! বাড়ে আরো দায়।
কেন এসো কেন যাও, কেন চাল কলা খাও,
তোমার প্রসাদে যদি টাকা না কুলায়।
তুমি ধর্ম্ম তুমি অর্থ, তার বুঝি এই অর্থ
তুমি মা টাকারূপিণী ধরম টাকায়।
টাকা কাম, টাকা মোক্ষ, রক্ষ মাতঃ রক্ষ রক্ষ,
টাকা দাও লক্ষ লক্ষ, নৈলে প্রাণ যায়।

টাকা ভক্তি, টাকা মতি, টাকা মুক্তি, টাকা গতি,
না জানি ভকতিস্তুতি, নমামি টাকায় ?
হা টাকা যো টাকা দেবি, মরি যেন টাকা সেবি,
অন্তিম কালে পাই মা যেন রূপার চাকায় ?

১৩

তুমি বিষ্ণুর হস্তে সুদর্শন চক্রে,
হে টাকে ? ইহ জগতে তুমি সুদর্শন।
শুন প্রভু রূপচাঁদ, তুমি ভানু তুমি চাঁদ,
ঘরে এসো সোনার চাঁদ, দাও দরশন ॥
আ মরি কি হেরি শোভা, ছেলে বুড়ার মনোলোভা,
হৃদে ধর বিবির মুণ্ড, লতায় বেষ্টন।
তব ঝন্ ঝন্ নাদে, হাবিয়া বেহালা কাঁদে,
তম্বুরা মৃদঙ্গ বীণা কি ছার বাদন।
পশিয়া মরম-মাঝে, নারীকণ্ঠ মৃদু বাজে,
তাও ছার তুমি যদি কর ঝন্ ঝন্।
টাকা টাকা টাকা টাকা।
বাক্সতে এসো রে ধন।

১৪

তোর লাগি সর্ব্বত্যাগী, ওরে টাকা ধন।
জনমি বাঙ্গালী-কুলে, ভুলিনু ও রূপে।
তেয়াগিনু পিতা মাতা, শক্রু যে ভগিনী ভ্রাতা,
দেখি মারি জ্ঞাতি গোষ্ঠী, তোর প্রাণ সুপে।

বুঝিয়া টাকার মর্ম্ম, ত্যজেছি যে ধর্ম্ম কর্ম্ম,

করেছি নরকে ঠাঁই, ঘোর কৃমিকূপে ॥

দুর্গে দুর্গে ডাকি আজ, এ লোভে পড়ুক বাজ

অসুরনাশিনি চণ্ডি আয় চণ্ডিরূপে !

এ অসুরে নাশ মাত !

শুম্ভে নাশিলে যেরূপে !

১৫

এসো এসো জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী উমে !

হিসাব নিকাশ আমি, করি তব সঙ্গে ।

আজি পূর্ণ বার মাস, পূর্ণ হলো কোন আশ ?

আবার পূজব তোমা, কিসের প্রসঙ্গে ?

সেই ত কঠিন মাটি, দিবা রাত্রি দুখে হাঁটি,

সেই রৌদ্র সেই বৃষ্টি, পীড়িতেছে অঙ্গে ।

কি জন্য গেল বা বর্ষ ? বাড়িয়াছে কোন হর্ষ ?

মিছামিছি আয়ুঃক্ষয়, কালের ভ্রুভঙ্গে ।

বর্ষ কেন গণি তবে, কেন তুমি এস ভবে,

পিঞ্জর যন্ত্রণা সবে বনের বিহঙ্গে ?

ভাঙ্গ মা দেহ-পিঞ্জর ! উড়িব মনের রঙ্গে ।

১৬

ওই শুন বাজিতেছে গুম্ গাম্ গুম্

ঢাক ঢোল কাড়া কাঁশি, নৌবত নাগরা ।

প্রভাত সপ্তমী নিশি, নেয়েছে শঙ্করী পিসী,

রাঁধিবে ভোগের রান্না, হাঁড়ি মাল্‌শা ভরা।

কাঁদি কাঁদি কেটে কলা, ভিজায়েছি ডাল ছোলা,

মোচা কুমড়া আলু বেগুন,

আছে কাঁড়ি করা॥

আর মা চাও বা কি? মট্‌কিভরা আছে ঘি,

মিহিদানা সীতাভোগ, লুচি মনোহরা!

আজ এ পাহাড়ে মেয়ের,

ভাল করে পেট ভরা।

১৭

আর কি খাইবে মাতা? ছাগলের মুণ্ড?

রুধিরে প্রবৃত্তি কেন হে শান্তিরূপিণি!

তুমি গো মা জগন্মাতা, তুমি খাবে কার মাথা?

তুমি দেহ তুমি আত্মা, সংসারব্যাপিনি!

তুমি কার কে তোমার, তোর কেন মাংসাহার?

ছাগলে এ তৃপ্তি কেন, সর্ব্বসংহারিণি?

করি তোমায় কৃতাঞ্জলি, তুমি যদি চাও বলি,

বলি দিব সুখ দুঃখ, চিত্তবৃত্তি জিনি;

ছ্যাডাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাং!

নাচো গো রণরঙ্গিণি!

১৮

ছয় রিপু বলি দিব, শক্তির চরণে
ঐশিকী মানসী শক্তি! তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ি।
বলি ত দিয়াছি সুখ, এখন বলি দিব দুঃখ,
শক্তিতে ইন্দ্রিয় জিনি হইব বিজয়ী।
এ শক্তি দিতে কি পার? ঠুসে তবে পাঁঠা মার,
প্রণমামি মহামায়ে তুমি ব্রহ্মময়ী।
নৈলে তুমি মাটির ঢিপি, দশমীতে গলা টিপি,
তোমায় ভাসিয়ে গাঁজা টিপি, সিদ্ধিরস্তু কই।
ঐটুকু মা ভাল দেখি, পূজি তোমায় মৃন্ময়ি!

১৯

মন-বোতলে ভক্তি-ধেনো রাখিয়াছি তারা,
এঁটেছি সন্দেশ-ছিপি বিদ্যার গালাতে।
শিখিয়াছি লেখা পড়া, দেবতায় মেজাজ কড়া,
হইয়াছি আধ পোড়া, সংসারজ্বালাতে।
সাহেবের হুকুম চড়া, গৃহিণীর নথনাড়া,
ঋণে করলে দেশ ছাড়া, পারি না পালাতে।
তাতে আবার তুমি এলে, টাকার হিসাব না করিলে
এতে কি মা ভক্তি মেলে সংসার লীলাতে?
বোতলে এঁটেছি ছিপি!
পার কি তুমি খোলাতে?

২০

কাজ নাই সে কথায় ; পূজা কর সবে।
দেশের উৎসব এ যে ঠেলিতে কে পারে ?
কর সবে গণ্ডগোল, দাও গোলে হরি বোল,
সাপুটি পাঁঠার ঝোল ফিরি দ্বারে দ্বারে—
যাত্রার লেগেছে ধুম, ছেলে বুড়ার নাহি ঘুম,
দেখ না জ্বলিছে আলো বঙ্গের সংসারে।
দেখ না বাজনা বাজে, দেখ না রমণী সাজে,
কুসুমিত তরু যেন কাতারে কাতারে !
তবু ত এনেছ সুখ মাতা বঙ্গ-কারাগারে।

২১

বর্ষে বর্ষে এসো মা গো, খাও লুচি পাঁটা,
ছোলা কলা কচু ঘেচু যা যোটে কপালে,
যে হলো দেশের দশা, নাই বড় সে ভরসা,
আস্‌বে যাবে খাবে নেবে, সম্বৎসর কালে।
তুমি খাও কলা মূলো, তোমার সন্তানগুলো
মারিতেছে ব্রাণ্ডি পানি, মুর্গী পালে পালে।
দীন কবি আমি মাতা, পাতিয়া আঙ্গট পাতা,
তোমার প্রসাদ খাই, ঘৃত আলোচালে॥
প্রসীদ প্রসীদ দুর্গে, প্রসীদ নগেন্দ্রবালে !

———

ঘোষজা মহাশয়ের দুর্গোৎসব

প্রথম উল্লাস।

শরৎকাল আসিয়াছে। সুতরাং কবির কল্পনায় আর সে বর্ষাকালীন দিগন্তব্যাপী গভীর মেঘগর্জ্জন নাই,—সে মুহুর্মুহুঃ বৃষ্টিপাত ও নাই। আকাশ এখন সুনির্ম্মল। এখন সেই সুনীল নভোমণ্ডলে ক্বচিৎ শেতাম্বুদকে বিবিধ মূর্ত্তি ধরিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। এই সময়টী যেমন রমনীয়, তেমনি নয়নাভিরাম, বিশেষতঃ এই কালে জগৎ প্রসবিনী, বিশ্বপালিনী, ত্রিজগজ্জননী মহামায়া ধরাধামে আসিবেন বলিয়া, ধরিত্রী কি এক অপরূপ মোহন বেশে সাজিয়া বিশ্বসংসারকে আনন্দ বারিতে অভিষিঞ্চন করিয়া থাকে। এই শারদীয় উৎসব সময়ে কত লোকের বহুদিনের পোষিত আশালতা ফলফুলে পরিশোভিত হয়, আবার কাহার বা তাহা অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সময়ে স্নেহময়ী জননী, সংবৎসরের পর প্রবাসস্থ প্রিয়পুত্র মুখ দেখিবেন বলিয়া ব্যগ্র হইয়া থাকেন। ওদিকে ভক্তিপরায়ণ পুত্র পিতৃ-মাতৃ সন্দর্শনাভিলাষে নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হন। পতিবিরহ বিধুরা কত সীমন্তিনী স্বামী সন্দর্শন-লালসায় ব্যকুল হৃদয়ে পথপানে চাহিয়া থাকে।

স্বামী ও নয়নানন্দ দায়িনী, জীবন তোষিণী প্রাণপ্রিয়া সহধর্ম্মিনাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য দিন গণিতে থাকেন, সময়ের মাহাত্ম অনুসারে। কত নির্জ্জীব লোক সজীব হয়, আবার কেহ বা নিরাশার গভীর নিখাতে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতে থাকে। শারদীয় উৎসব—বাঙ্গালির সার এবং শ্রেষ্ঠ উৎসব। বাঙ্গালির গৃহে গৃহে মহাধুম পড়িয়া যায়।

কেহ পুত্র কন্যাদের জন্য বিবিধ মনোরম সামগ্রী কিনিতেছেন। কেহ বা অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপিণীর সোহাগ বাড়াইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া, কাপড় বিক্রেতার দোকানে, ঢাকাই, গুলবাহার, বোম্বাই, নীলাম্বরী, কল্কাপেড়ে, মিসিপেড়ে, বাবুধাক্কা, গলাধাক্কাপেড়ে সাড়ী কিনিতেছেন। কেহ বা চন্দ্রহার, গোট, বালা, অনন্ত, গোঁপহার, ছেলেহার, চিক, কান, ঝাঁপটা এবং ফুল ইত্যাদির জন্য স্বর্ণকারকে রাত্রে ঘুমাইতে দিতেছেন না। কেহবা বডি সেমিজ কামিজের জন্য কত কত নবীন প্রবীন কোম্পানিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছেন। গন্ধ বিক্রেতার দোকানে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক,—কেহ অটোডিরোজ কেহ বা হোইট, কেহ বা ড্যাম্যাস্করোজ, কেহ বা গমনেলের সাবান ইত্যাদি বিবিধ মন ভোলানো জিনিস কিনিয়া মনের উল্লাসে বাক্সবন্দী করিতেছেন। আর যাহার পুত্র কলত্র নাই, আশা নাই, আকাঙ্খা নাই, প্রিয় সমাগমের উপায় নাই, সুখের আশায় যেদিকে চাহিবে সেস্থান কিংবা তাহার নিদর্শন মাত্রও নাই; তাহার জীবন আজ ঘোরতর মরুময়। তাহার জীবন আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্মশান ক্ষেত্রের সহিত তুলনীয়।

আজষষ্ঠী, কলিকাতা সহরে ভারি ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

কাহার বাড়ীর দ্বারে মঙ্গলময় পল্লব, জলপূর্ণ ঘট। কাহার দ্বারে নব বিকশিত পুষ্পমালা শোভা পাইতেছে। কাহার বা তোরণ দ্বারোপরি মৃদু মধুর নহবত বাজিতেছে। এইরূপ অনেক বাড়ীতে আনন্দের উচ্ছ্বাস যেন উথলিয়া পড়িতেছে, কিন্তু এই সহরের আর একটী বাড়ীর ভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাড়িটী খুব বড়, তিন মহল, বাহিরে পূজার দালান এবং বৈঠকখানা। বাল্যাবস্থায় বাড়িটী বড় আহ্লাদ করিয়া, সাদা ধপ্‌ধপে দেখাইবে বলিয়া সর্ব্বাঙ্গে চূণ মাখিয়াছিল; কিন্তু কালের এমনি উৎপাত যে, সাফের চূণ কাম এখন সব খসিয়া পড়িয়াছে।

অনেকস্থানে নোণা ধরিয়াছে। কোথায় বা টালি খসিয়া পড়িয়াছে, ছাতের আলিসা ভাঙ্গিয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, বাড়ীটী পুরাতন খোলস বদলাইবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছে। এহেন বাড়ীর পূজার দালানে দশভুজার মূর্ত্তি রহিয়াছে। প্রতিমার সম্মুখে মৃণ্ময় দীপধারে একটি প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। দালানের একধারে একটি ছেঁড়া শপে কয়েকজন বসিয়া আছেন। মান্ধাতার আমলের একখানি আসনে পুরোহিত ঠাকুর উপবিষ্ট, আর বাড়ীর যিনি খোদ কর্ত্তা তিনি নিরাসনেই বসিয়া আছেন। সকলেই একমনে প্রতিমা চিত্রিত করা দেখিতেছেন। পটোর ও মালার সঙ্গে কিরূপ বন্দোবস্ত আছে, তাই ত জানি না; তবে প্রতি বৎসরই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সকলের বাড়ীতে প্রতিমা চিত্রিত করিয়া এবং সাজাইয়া, যে রংটুকু বাঁচে, সেই রং এবং যে সাজ উদ্বৃত্ত হয়, তাহাই লইয়া কেবল বুদ্ধিবলে এ বাড়ীর প্রতিমার রং ফলায় এবং রাঙ্‌তা দিয়া সাজায়। এই সকল সরঞ্জাম

লইয়া পটোকে এবং মালীকে আজ এ বাড়ীর কাজ সারিয়া যাইতেই হইবে কেননা কাল সপ্তমী।

কু-লোকের যেমন কু-অভ্যাস। তাহাদের ত কোন কাজ কর্ম্ম নাই। কোন একটা আছিলা পেলেই তাহারা লোকের নামে নানা কলঙ্ক রটাইয়া থাকে। আমাদের এই বাড়ার বাবুর নামে লোকে কত কি বলে, কত কথা কাণা-কাণি করে। তাহারা বলে, এ বাবুর নাম করিলে সেদিন আর অন্ন জোটে না। এমন কি, বাবুর নামের এমনি মাহাত্ম যে তাঁহার নাম করিবা মাত্র ভরা ভাতের হাঁড়ি ফাসিয়া যায়, বাড়া ভাত কুকুর স্পৃষ্ট হয়। ইহা যে কতদূর সত্য, তাহার সঠিক সংবাদ আমরা দিতে পারিলাম না, তবে এ বিষয়ের আমরা যেরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা বলিতেছি।

আমোদপ্রিয় বাবুরা আমোদ করিয়া গ্রাবু খেলিতে বসিয়াছেন। খুব রোকের সঙ্গে তাস খেলা চলিতেছে, একপক্ষ ছক্কা ধরিয়াছে, আবার চারিখানা কাগজ ও হইয়াছে, তাহাদের পড়তাও বেশ পড়িয়াছে, প্রতিহাতে গোলাম, নহলা, টেক্কা, সাহেব আসিতেছে,— ব্যোম হয় আর কি !! এমন সময় প্রতিপক্ষেরা বলিয়া উঠিল,— "দেখ্‌চ কি ? এক কথায় তোমাদের ছক্কা, পাঞ্জা, ব্যোম কোথায় উড়িয়া যাইবে। দেখবে তবে—এই দেখ।" এই কথা বলিয়া তাহারা আমাদের বাবুর নামটী একবার স্মরণ করিয়া কাগজ কয়খানিতে হাত বুলাইয়া দিল। বিধির বিচিত্র লীলা যেমন বুঝা ভার, তেমনি আমাদের বাবুর নামেও অপার মহিমা সকলের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কেননা, উক্ত নামটী করিবামাত্র জিত-

কাতের হাতে গোলাম, নহলা, টেক্কা আসা সত্ত্বেও, সেই সব কয়খানি কাগজ একেবারে উঠিয়া গেল !! ইহা নামের মাহাত্মে ঘটিল, কি আর কোন কারণ বশতঃ হইল, তা তোমাদের যাহা ইচ্ছা বলিতে হয় বল ; আমি কিন্তু যাহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে, তাহাই এই স্বনাম প্রসিদ্ধ বাবুটী থেকে. তাঁহার পরিচয় দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার এখন নামটী পর্য্যন্তও করি নাই, কিন্তু নামটী করা ত বড় সহজ ব্যাপার নহে, সে নামটী মুখাগ্রে আনিলে কি যে ঘোর বিভ্রাট্ ঘটিবে, তাও ত বলা যায় না। আবার নামটা না করিলে গল্পও হয় না ; কেননা, নায়ক-নায়িকা বিহীন গল্প ত ভাল দেখায় না, কাজেই নামটী না করিলে আর চলিতেছে না। কি করি, এ বিপদের ঝটিকা না হয় লেখকের মাথার উপর দিয়া যা'ক। লেখক না হয় একদিন উপবাস করিবে। তবে পাঠকদের পূর্ব্ব হইতে সাবধান করিয়া রাখি, তাঁহারা যেন চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় যাহা জুটিবে, তাহা আকণ্ঠ পর্য্যন্ত আহার করিয়া আমার এই গল্প শুনিতে বসেন। ইহার পর যদি কোন বিপদ ঘটে, তাহা হইলে লেখক নাচার এবং সেজন্য লেখককে দোষ দিতে পারিবেন না।

তবে এক্ষণে সকলের অনুমতি লইয়া নামটা করি—কিন্তু দেখবেন, খুব সাবধান—তবে বলি –বাবুটীর নাম—"তারিণী ঘোষ।" তাঁহার নামটা ত কেহ কখন মুখে আনে না, ঠারে ঠোরেই বলিয়া থাকে। কেহ বলে—"অমুক ঘোষ" কেহ বলে "ফলনা ঘোষ" কেহ বলে "বড় কর্ত্তা"।—এই রূপেই আমাদের ঘোষজ মহাশয় জনসমাজে অবিহিত এবং পরিচিত হইয়া থাকেন। পূরা নামটা

কেহ কখন করেও না, আমরাও তাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক করিব না।

ঘোষজ মহাশয়ের পিতার নাম রামতনু ঘোষ। তিনি বহুকষ্টে অগাধ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার দান ধ্যান, লোকলৌকতা এবং নানাবিধ সদ্ব্যয় ছিল। তাঁহার সময়ে বারমাসে তের পর্ব্বাহ হইত। দুর্গোৎসবের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পাড়ার লোকদের কাহারও ঘরে হাঁড়ি চড়িত না, সকলেই রামতনু বাবুর বাড়ীতে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিত। লোকে আজও গল্প করে যে, পূজার কয়েকদিন তাঁহার বাড়ীতে দইয়ের কাদা হইত, ক্ষীরের সাগরে লোকজন সাঁতার দিত, আর সন্দেস মেঠাই লইয়া ছেলেগুলো ভাঁটা খেলিত। কালক্রমে রামতনু বাবুর মৃত্যু হইল। তাঁহার এক মাত্র পুত্র আমাদের সুপরিচিত শ্রীমান্—ঘোষ তাঁহার অতুল বিভবের উত্তরাধিকারী হইলেন। পিতা যে কত টাকা রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাহা কেহ স্থির করিয়া বলিতে পারে না। তবে লোকে কানাকানি করিত, মৃত রামতনু বাবুর একটী গুপ্ত ঘর ছিল, সেই ঘরে ঘড়া ঘড়া মোহর এবং টাকা পোঁতা আছে।

তখন সময়ে সময়ে হাত পড়িত, কিন্তু এখন হইতে তাহাতে ছাতা পড়িতে সুরু হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় যদিও এখন দোল দুর্গোৎসব সকলই বজায় আছে বটে, তবে প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বের রসনা তৃপ্তিকর সুরসাল ভাল ভাল খাদ্য সামগ্রী বাড়ীতে ছড়াছড়ি যাইত, এখন যেন তাহা কোথায় অন্তর্দ্ধান হইয়া গিয়াছে। আর তাহার পরিবর্ত্তে লোকদের নিরম্বু উপবাসটা যেন একচেটে হয়ে পড়েছে।

TI PIO
THE ENGLISH MAN
খোলা ভাটী
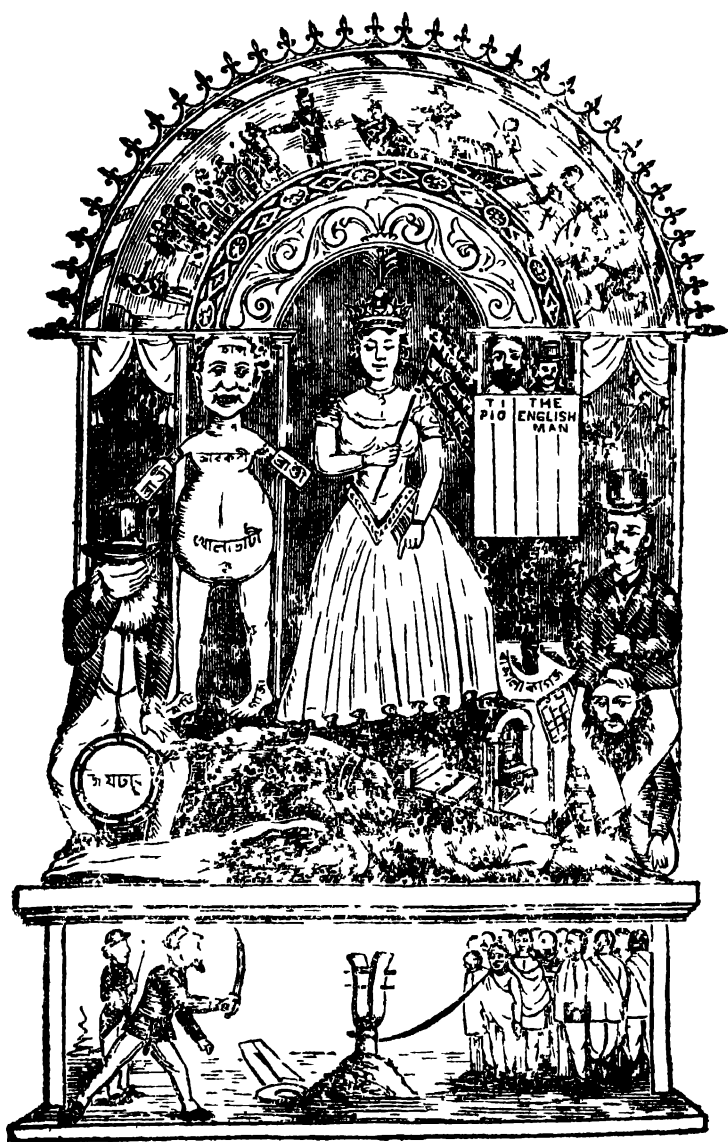
দ্বিতীয় উল্লাস

ষষ্ঠীর দিন ঠিক সন্ধ্যার সময় ঘোষজ মহাশয়ের পূজার দালানে পূর্ব্বকথিত কয়েকজন বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটী লোক অতিধীর পদবিক্ষেপে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটীর চেহারা অতিমলিন, কণ্ঠার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। নয়নদ্বয় কোটর প্রবিষ্ট তাহা আবার জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ; কেশ অতি রূক্ষ পরিধান অতি মলিন কাপড় এবং স্কন্ধে আধ ময়লা একখানি চাদর। গলার আওয়াজটা বড় খাদ। লোকটী পূজার দালানস্থ সিঁড়ির নিকটে আসিল এবং অতি সন্তর্পণের সহিত চাদরখানি গলায় দিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করত বলিতে লাগিল ;—

"আস্তিকস্য মুনের্ম্মাতা ভগিনা বাসুকেস্তথা।
জরৎ কারু মুনেঃ পত্নী মনসা দেবী নমোস্তুতে।
আস্তিক আস্তিক গরুড় গরুড় ॥"

শেষ কয়েকটী কথা কিছু উচ্চস্বরে বলিল। তাহার এই অসময়ে এইরূপ অপ্রাসঙ্গিক মন্ত্র শুনিয়া দালানস্থ সকলে "হাঁ হাঁ কল্লিকি, কল্লিকি ?" বলিয়া একেবারে মহা হুলস্থুল বাধাইয়া দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন রাগ সামলাইতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"তবেরে পেঁচো বেল্লীক, গেঁজেল গাঁজা খেয়ে তোর বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গেছে দেখছি। তোর

আক্কেলটা কি বল দেখি ? তুই এই দুর্গা পূজার দালানে কি বলে মনসার প্রণামটা কল্লি ?"

২য় ব্যক্তি। যে চব্বিশ ঘণ্টা গাঁজা খায় তার যদি আক্কেল থাকবে, তবে সে এ কথা বলবেই বা কেন ?

সদ্গোপবংশ অবতংস পঞ্চানন্দ ওরফে পাঁচু বা পেঁচো বাল্যকালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ হয়। তাহার পরও কিছু দিন লেখাপড়া করিয়াছিল, কিন্তু সঙ্গ দোষে সে এখন একেবারে বিগ্‌ড়িয়া গিয়াছে, এখন তাহার গাঁজাই ধ্যান, গাঁজাই জ্ঞান, গাঁজাই তাহার ভবনদী পার হইবার একমাত্র ভেলা স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু তা বলিয়া কি তাহার কোন গুণ ছিল না, এমন বলিতেছি না; তাহার একটি বিশিষ্ট গুণ ছিল যে, তাহাকে কোন পুরা মজলিসে ছাড়িয়া দেও, সে তাতার উদ্ভাবনী শক্তি প্রভাবে নূতন নূতন রঙ্গপূর্ণ কথায় তাহা মাৎ করিয়া তুলিবে। সে যাহা হউক, আজ পাঁচু, সপ্তরথী পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদের বাক্যবাণে একেবারে জ্বর জ্বর হইয়া উঠিল। উক্তপূজার দালানস্থ একে একে সকলেই তাহাকে তিরস্কার এবং র্ভৎসনা করিয়া মনের সাধ মিটাইয়া লইলেন। তাঁহাদের পালা শেষ হইলে, পাঁচু গলায় বস্ত্র দিয়া যোড়হস্তে বলিল,—"মহাশয়গণ গো! রাগ করিবেন না, আমি গাঁজা খাই বটে, কি তা বলে যে আমি একেবারে নিতান্তই গেঁজেল, এ কথাটা মনে করিবেন না ?"

৩য় ব্যক্তি। তুমি যদি গেঁজেল নও, তবে তুমি কি বাপু ? আর গেঁজেল না হলে কি কেহ কখন দুর্গোৎসবের সময় দুর্গাপূজার দালানে আসিয়া মনসার প্রণাম করে ?

পাঁচু। শুধুমাত্র রাগ কল্লে হয় না। আর আমাকে গেঁজেল বলে উড়িয়ে দিলেও চলবে না, ভিতরের খবরটা রাখেন কি?

১ম ব্যক্তি। ভিতরের খবর আবার কি?

২য় ব্যক্তি। আজ বুঝি আড্ডা হতে কোন নূতন গাঁজাখুরী গল্প শুনে এসেছে?

পাঁচু। আজ্ঞা এ বড় গাঁজাখুরী গল্প নয়, আর কোন আড্ডার কথাও নয়।

৩য় ব্যক্তি। "তবে কি বাপু, তুমি না হয় তাহা প্রকাশ করেই বল না। অত বাক্যব্যায় কর্‌চ কেন?"

পাঁচু। আজ্ঞে, কিন্তু আমার একটী কথা আছে; আমি গল্প বল্‌তে আরম্ভ করলে মধ্যস্থলে কেহ আমাকে বাধা দিয়া থামাইতে পারিবেন না। গল্প ভাল না লাগিলেও কেহ বিরক্ত হইতে পারিবেন না। গল্প দীর্ঘ হইলেও, গল্প বলিতে অধিক সময় লাগলেও কেহ উঠিয়া চলিয়া যাইতে পারিবেন না, ইহা আমার প্রতিজ্ঞা। আপনারও যদি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন, তাহা হইলে কেন যে আজ দুর্গোৎসবের দালানে মা মনসাদেবীর প্রণাম মন্ত্র পাঠ করিলাম, সে বিষয় খুলিয়া বলি। নহিলে পাঁচু এখন বলিয়া যায়।

সভাস্থ প্রায় সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হাঁ, তাই হবে, তুই বেটা শীঘ্র গল্প আরম্ভ কর।"

পাঁচু। তবে আমার দায় দোষ নাই;—আপনারা মনযোগ দিয়ে শুনুন, আমি বলিতেছি,—আজ ষষ্ঠীর দিন, মহামায়া আসিবেন বলে মনটা কিছু প্রফুল্ল ছিল। তাই আজ কয়েক ছিলেম বেশী মাত্রায় টানা হয়। নেসায় নেহাৎ বুঁধ হয়ে ঘোষেদের আটচালায়

বসে আছি, জানিনা কেন হঠাৎ চমক ভাঙিল। চক্ষু মেলিয়া দেখি, কেন এক অজানিত স্থানে এসে পড়েছি; চারিদিকে পাহাড় আর গাছ। কোথাও মন্দার, পারিজাত, সরল, সাল, তাল, তমাল, অর্জ্জুন। কোন স্থান বা আম্র, কদম্ব, নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, অশোক, বকুল, মল্লিকা, মাধবী ইত্যাদি কুসুমিত শ্যামল শোভাময় নানা জাতীয় বৃক্ষ এবং লতা দ্বারা পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে। সেখানে মধুর কণ্ঠ বিহগকুল প্লুত স্বরে গান করিতেছে। বন মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভাল্লুক, শরভ, মত্তমাতঙ্গ, মৃগ শাখামৃগ ইত্যাদি নানাবিধ বন্য জন্তু বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। আমি তথা হইতে কিছু দূরে গিয়া দেখি, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড শ্বেত প্রস্তরের অট্টালিকা। তাহার সুনির্ম্মল শ্বেত আভা যেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই মহাভবনে বিবিধ কারুকার্য্যের যে কি বিচিত্র ঘটা তাহা বর্ণনা করা মৎসদৃশ ক্ষীণকায় ব্যক্তির ক্ষমতার অতীত। বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি, দেউড়ীতে বিকট মূর্ত্তি দুইটী লোক দ্বার রক্ষা করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন সিদ্ধি খুঁটিতেছিল, আর অহো! একজন গাঁজা টিপিতে ছিল।

আর থাকিতে না পারিয়া প্রথম ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন,—

"পেঁচো, তুই সাপের মন্ত্র আওড়াতে বসলি কেন?

—যা তোর বলবার আছে, বলে ফেল না!!"

পাঁচু। (যোড় হাতে) আজ্ঞে আমাকে মধ্য পথে বাধা দিয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে পুন্নাম নরকে বাস হয়। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া ভীষ্ম প্রতিজ্ঞ হউন।

সকলকে নীরব করিয়া পাঁচু বলিতে আরম্ভ করিল ;—"আরও কিছু নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র চিনিলাম। তাহারা আমার চির পরিচিত নন্দী ও ভৃঙ্গী। তখন আমার দিব্য চক্ষু ফুটিল এবং বুঝিলাম যে, আজ গাঁজার প্রসাদে একেবারে সশরীরে কৈলাশপুরে আসিয়াছি। তখন মনে হইল, আজ আমরা বড় জোর কপাল বলিতে হইবে। মুনি ঋষিরা যুগ যুগান্তর তপস্যা করিয়া যাহা সহজে লাভ করিতে পারেন না, আমি ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া শুদ্ধ কয়েক ছিলেম গুণময়ী গাঁজার জোরে সেই মহামোক্ষ ফল হস্তগত করিয়াছি। তখন আর আমার আহ্লাদ আর ধরে না। আমি একেবারেই নন্দী ভৃঙ্গীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমার মনে মনে একটা বড় ভয় ছিল, পাছে তাহারা আমাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিয়া দেয়। কিন্তু রতনে রতন চেনে, আমাকে দেখিবামাত্র, তাহাবা আমাকে চিনিয়া ফেলিল। অনেক খাতির যত্ন করিয়া নিকটে বসিলে বলিল এবং দেশের কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম, "দেশের দশা আর কি বলিব।—একে জলকষ্ট, তাহার উপর দুর্ভিক্ষ তাহাতে আজকাল আবার রসাতঙ্ক হইয়াছে। এ ত্র্যহস্পর্শে লোক আর বাঁচে কেমন ক'রে বল! যিনিগৃহিণী তিনি আমার জননীকে কবিতে চাহেন দাসী,—আর এই দাসীপুত্র আমাকে করিতে চাহেন,—ক্ষেতে খাটা কৃষাণ। গৃহিণী উঠেন বেলা এক প্রহরে, ঢাকাই শাড়ী তাঁহার আটপহুরে, ওস্তাদ বিলক্ষণ আহারে, আর আছেন সদাই খোস বাহারে। গৃহিণী বলেন—

"পড়বো বই, উঠবো গাছে, চড়বো মই,
মারবো পাড়ী ভাঙ্গবো ছই, ধরবো তান্—
'কদম্বের মূলে দাঁড়িয়ে কালা কৈ ?'

'আমি একা কত কথা বলবো—তবে মাত স্বয়ংই যাচ্ছেন। তিনি স্বচক্ষে দেশের সদ্গতি দেখবেন।' এই সকল কথাবার্ত্তার পর ভৃঙ্গী আমাকে সঙ্গে করিয়া কৈলাসপুরীর মধ্যে লইয়া গেল।

তৃতীয় উল্লাস।

পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার জ্ঞান রহিত হইয়া গেল। ভয়ে বুক কাঁপিতে লাগিল। আর দু'পা অগ্রসর হইতে যেন সাহস হইল না, যা হোক, ভাগ্যে সঙ্গে ভৃঙ্গী ছিল, বলিয়াই রক্ষা, নতুবা ভয়ে মুখ থুবড়ে পড়িয়া যাইতেছিলাম। বাড়ীর প্রথম মহলের শোভা দেখে, আমার তো একেবারে চক্ষু স্থির। যখন বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং স্বহস্তে যেখানে যাহা শোভা পায়, সেখানে সেই জিনিস দিয়া সাজাইয়াছেন। তখন সে সৌন্দর্য্যের আর কি কোন খুঁত আছে ? প্রাঙ্গণের স্থানে স্থানে দেখিলাম,—জাতী, যুথী, মল্লিকা, মালতী, গোলাপ, গন্ধরাজ ইত্যাদি নানাবিধ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। দালানের ধারে ধারে উজ্জ্বল রঙের মাটীর টবে ভায়লেট, ভার্ব্বিণা, জিরেনিয়ম, চন্দ্রমল্লিকা এবং আরও কতশত গাছ সারি সারি সাজান রহিয়াছে। তাহার

পর "ড্রয়িংরূমের" দিকে গেলাম। সে ঘরটী মস্ত বড়। চারি আঙ্গুল পুরু বিচিত্র বর্ণের একখানি সুকোমল গালিচা পাতা রহিয়াছে। তাহার উপর শ্বেত পাথরের এবং মেহগনি কাঠের বড় বড় টেবেল, চেয়ার, ইজিচেয়ার, সোফা, কচিচ, ইত্যাদি বসিবার নানা প্রকার আসন সাজান রহিয়াছে। উপরে নীল, পীত, লোহিত, বহুবর্ণের ঝাড় লণ্ঠন ঝুলিতেছে। দেখিলে বোধ হয়, বিশ্বকর্ম্মা, হ্যামিল্টন এবা অসলারের দোকান একেবারে খালি করিয়া আনিয়াছেন। এই ঘরের একধারে একখানা প্রকাণ্ড ইজিচেয়ারে ভবানী পতি ভূতনাথ। গাঁজায় দম মেরে বেদম হয়ে আলুথালু বেশে আধশোওয়া গোছ হয়ে আছেন। আল বোলার নলটা তখন পর্য্যন্ত হাতে আছে বটে, কিন্তু হস্তভ্রষ্ট হয়ে পড় পড় হইয়া রহিয়াছে।

একে ত গাঁজার নেশায় তিনি নিজঝুম্ নীরব, তাহাতে আবার অর্দ্ধাঙ্গ ভাগিনা শক্তিরূপিণী ভগবতী তিন দিনের জন্য পিত্রালয়ে যাইবেন। তাহার দরুণ বিরহ ব্যথা সহ্য করিতে হইবে বলিয়া নয়ন-এয়-বিভূষিত চারুমুখ বড়ই পরিম্লান হইয়াছে। পিনাক পাণির অপূর্ব্ব বিন্যাস বিশিষ্ট জটাভার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শিরোভূষণ শশিকলা এখন হীন প্রভা হইয়াছে। বিধুখণ্ড বিমণ্ডিত কপালে চিন্তারেখা প্রকটিত হইয়াছে। ধূর্জ্জটি এই ভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহার বামদিকে একটী বড় টেবিল। তাহার সম্মুখে স্প্রিংয়ের গদি আঁটা চেয়ারে বহুরত্ন মণ্ডিতা। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কারিণী, তীব্র জ্যোতির্ম্ময়া জগন্মাতা স্বয়ং দশভূজা বসিয়া আছেন। পরিধানে রত্ন খচিত মহামূল্য একখানি বারাণসী শাটী। গায়ে

মহাপ্রভাযুক্ত মণি মাণিক্য শোভিত বিচিত্রবর্ণের ওড়না; মণিমুক্তার আভায় তাহা ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। দক্ষিণে, ধন-ধান্যাদি সম্পদ দাত্রী, অশেষ সৌভাগ্য বিধায়িনী লক্ষ্মী; বামে শ্বেতাম্বর বীণাপাণি বাগ্‌দেবী সরস্বতী; একপার্শ্বে মণি মণ্ডিত কাঞ্চন কণ্ঠ নিত্য বরদাতা, বিঘ্ন বিনাশন শশি সূর্য্য সমপ্রভাযুক্ত গণনায়ক; অপর পার্শ্বে অমিত বলবীর্য্যশালী কুমার কার্ত্তিকেয়। আজ সকলেই মহাব্যস্ত; বিশেষত গিরিরাজ পুত্রী জগজ্জননী পার্ব্বতী। তাঁহার সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রাশি রাশি টেলিগ্রাম নিমন্ত্রণ পত্র রহিয়াছে। তিনি দশহাতে তাহা খুলিতেছেন এবং পড়িয়া যথাস্থানে রাখিতেছেন। এমন সময়ে নন্দা আসিয়া তাঁহার হাতে একখানি পত্রদিয়া বলিল,—"মা! ডাকে এই চিঠি-খানি আসিয়াছে। কিন্তু পত্রখানি বিয়ারিং, আমি বাজার খরচের পয়সা হইতে চারিটী পয়সা দিয়া ডাকহরকরাকে বিদায় করিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া অদ্রিসুতা কিছু বিরক্ত ভাব প্রকাশ করত বলিলেন,—"আমাকে আবার বেয়ারিং পত্র কে লিখিল?" নন্দী। তা তো মা, জানিনা, ঐ পত্র পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন।

নগররাজবালা পত্রখানি খুলিয়া এদিক ওদিক উল্টাইয়া পল্টাইয়া বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি ত কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। পাছে "কালীর আঁচড়" দিলে ধার কর্জ্জ হয়। এই ভয়ে পত্র লেখক যেন বিশেষভীত, তাই তিনি পত্রে কালীর সঙ্গে ততটা সংস্রব রাখেন নাই। যেন তেন প্রকারেণ আপনার কার্য্য উদ্ধার করিয়াছেন। যাহা হউক, মাতা জগত্তারিণী পত্রখানি লইয়া কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি অতি কষ্টে

ও পত্রথি অবগত হইতে না পারিয়া, লক্ষ্মীর হাতে পত্রখানি দিয়া বলিলেন,—"দেখ ত মা লক্ষ্মা! এ পত্রখানি কে লিখেছে?" লক্ষ্মী পত্রখানি লইয়া বিশেষ যত্ন সহকারে পড়িবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে "কালীর আঁচড়" আদৌ নাই। পড়বেন কেমন করে বল? শেষে হতাশ হইয়া বলিলেন।—"আমি ত ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, এ যে রূপ লেখা, তাহা সহজে বোধগম্য হওয়া ভার।" লক্ষী বিফল প্রযত্না হইলে একে একে গণেশ কার্ত্তিককে পত্রখানি দেখান হইল, কি কেহই দন্তস্ফুট করিতে পারিলেন না।

শেষে সরস্বতীর হাতে পত্রখানি দিয়া কহিলেন—"দেখ দেখি সরস্বতী! তুমি ভিন্ন দেখছি কেহ এ পত্র পড়িতে পারিবে না; তুমিই পড়।"

সরস্বতী পত্রখানি হাতে লইয়া, অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পার্ব্বতীকে বলিলেন,—"এত দিনের পর দেখছি আমাকে ও হার মানিতে হইল, এ পত্র আমিও পড়িতে পারিলাম না, ইহা আমার বুদ্ধি বিছার অগোচরে।" ভগবতী এবার সত্য সত্যই কিছু বিষন্ন হইলেন। অবশেষে অনেক ভাবনাচিন্তার পর তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"ওহো, এতক্ষণের পর বুঝেছি, এ দেখছি সেই তারিণী ঘোষ পত্র লিখেছে।"

এই কথা বলিবা মাত্র উদ্ধত যুবাকার্ত্তিক বলিয়া উঠিলেন, "মা! এমন কাজ করিতে হয়? আমরা সবে মাত্র এক এক-পেয়ালা চা খেয়েচি, আর এখনও কিছুই খাই নাই, এমন সময়

কিনা আপনি সেই অনামুখোর নাম কল্লেন। আজ দেখছি আমাদের আর খাওয়া হইবে না।”

কার্ত্তিকের কথা শুনিয়া শৈল সুতার তাম্বুল রাগ রক্ত ফুল্লাধরে হাসির রেখা ঈষৎ অঙ্কিত হইল এবং বলিলেন,—“তোমাদের সে ভাবনা করিতে হইবে না, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।”

অনেক কষ্টের পর পত্র প্রেরকের নামটাও ঠিক হইল বটে, কিন্তু এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে এখন যায় কে? এই লইয়া পার্ব্বতীর মহাভাবনা উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে বিলক্ষণ জানিতেন,—ঘোষের বাড়ীর পূজায় কেহই যে সহজে যাইবে এমন বোধ হয় না। কিন্তু সেখানে না যাওয়াটা ত বড় ভাল দেখায় না; সে যেরূপ প্রকৃতির লোক হউক না কেন। সেও ত তাঁহার একজন ভক্ত।

চতুর্থ উল্লাস

জগদম্বা অনেক চিন্তা করিলেন, মনে মনে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিলেন, ঘোষজার বাড়ীতে কাহারও না যাওয়াটা যে একেবারেই ভাল দেখায় না, ইহা সিদ্ধান্ত হইল; তখন ভবানী লক্ষ্মীকে বলিলেন,—“দেখ মা লক্ষ্মী! এবার তোমাকেই সেই ঘোষের বাড়ী যেতে হবে।”

লক্ষ্মী। না মা! আমি ও বাড়ীতে কখনই যাইতে পারিব না। আমি বর্দ্ধমানের মহারাজের বাড়ী যাইব। সেই আমার

হলো প্রকৃত স্থান, সেইখানে আমার অটল, অচল হয়ে থাকবার কথা। আমি সে বাড়ী পরিত্যাগ করে আর কোথাও যাইতে পারিব না। আপনি আর অন্য কাহাকে ও পাঠাইয়া দেন।

ভগবতী। তবে মা সরস্বতি! তুমিই যাও।

সরস্বতী। আমি চির দিন নদিয়ার নবদ্বীপে গিয়া থাকি, সেই আমার পীঠস্থান। সেই স্থানে আমার যত মান সম্ভম, আদর অভ্যর্থনা, এমন আর কোন স্থানে নাই; এখন শ্মশান হইলেও আমি নবদ্বীপটী ত্যাগ করে আর কোথাও যাইতে পারিব না।

ভগবতী। আচ্ছা। তবে গণেশ! তুমিই না হয় যাও?

গণেশ। "মা! আমি তারক পরামাণিকের বাড়ী যাই। সেখানে সিদ্ধিদাতা হইয়া বসি। সেই মঙ্গলময় স্থান পরিত্যাগ করে, অন্য কোন স্থানে যাওয়া আমার কখনই সম্ভবে না।"

ভগবতী। তবে বাপু কার্ত্তিক! তুমিই যাও?

কার্ত্তিক। আপনি বলেন কি মা! আপনি কিনা সেই অনামুখোর বাড়ীতে আমাকে যেতে বলেন? আমি শ্যাম নটবরের বাড়ী যাব, সেখানে কত রঙ্‌ বেরঙের "পাগড়ী" পরিব, আমোদ আহ্লাদ করে চারিদিক্ ঘুরে ফিরে বেড়াব। থিয়েটার দেখব, সেই অপ্সরাবিনিন্দিত রমণীর কণ্ঠ নিঃসৃত স্বর্গীয় গীত শুনিয়া কর্ণ তৃপ্ত করিব।

আমি এমন প্রেমপূর্ণ জায়গা ত্যাগ করে কি অন্য কোন স্থানে যাইতে পারি? আপনি আর কাহাকেও পাঠাইয়া দিন।

ভগবতী। সিংহ! তবে তোমাকেই যেতে হচ্ছে দেখছি,

একজন না গেলে ত ভাল দেখায় না।

সিংহ এতক্ষণ টেবিলের নীচে শুইয়া ছিল, সে এই কথা শুনিয়া কেশর ফুলাইয়া হেলিতে ছুলিতে এবং লেজ নাড়িতে নাড়িতে মা ভগবতীর সম্মুখে আসিয়া বলিল—"মা! আপনি ত বেশ জানেন, আমি আজন্মকালটা শোভাময় বাজারের বাহাদুরদের বাটীতে গিয়া থাকি। সেখানে চিরদিনই বৃটিশ সিংহের পদার্পণ হয়ে থাকে। যেমন যজ্ঞেশ্বর বিনা যজ্ঞপূর্ণ হয় না, সেইরূপ তথায় বৃটিশ সিংহের পদধূলি ভিন্ন কোন কাজই সিদ্ধ হয় না এবং পূজাও হীনাঙ্গ হয়। সে যা হোক, এমন স্থলে না গেলে ত আমার কাজ চলে না। আমি সেখানে যাব, বৃটিশ কেশরীর সঙ্গে একাসনে বসে, সেক্ হ্যাণ্ড করে গা শুঁকাশুঁকি করিব। এক টেবিলে বসে আহারাদি করিব, তাহার পর নাচ তামাসা দেখে দেখে চক্ষু সার্থক করিব। এমন আনন্দপূর্ণ স্থান ছেড়ে কি আমি সেই হতভাগার বাড়ী যেতে পারি? মা আমাকে ক্ষমা করুন। আর যাহাকে ইচ্ছা হয়, তাহাকেই পাঠাইয়া দিন।"

তখন মা জগদম্বা মহিষাসুরের মুখপানে তাকাইয়া বলিলেন,—"বাপু অসুর! তোমাকেই দেখছি সেখানে যেতে হচ্ছে, তুমি ভিন্ন আর কে যাবে বল?"

মহিষাসুর যোড় হাতে বলিল,—"জগদীশ্বরি! আমাকেও অজ্ঞাটী করিবেন না। আপনি ত সকলই জানেন, আমি চিরকালটা কে, ডি, বসুর বাগানবাড়ীতে যাই, সেখানে পিপে পিপে মধুপাচার করি, নানা অঙ্গভঙ্গী করে নাচি, গাই চলিতে থাকি, মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিই, কাদা মাখি। এই তিন দিন আমাদের তাণ্ডবের

চোটে ধারখানা টলটলায়মান হয়।

এমন মজার স্থান ছেড়ে কি আমি অন্য কোন স্থানে যাইতে পারি? আপনি সেই অনামুখোর বাড়ীতে কাহাকেও পাঠাইয়া দিন, আমি সেখানে কোন ক্রমেই যাইতে পারিব না; বিশেষতঃ নিরম্বু উপবাস করাটা কস্মিন্ কালে আমার অভ্যাস নাই।"

জগদম্বা দেখিলেন,—তাঁহার ভক্ত ঘোষের বাড়ী কেহই যেতে চায় না, অবশেষে চালচিত্রদের একে একে তথায় যাইতে বলিলেন। তাহারা বলিল,—'না মা! আমরা আর্টস্কুলে প্রণয়ে চিরবদ্ধ। সে স্থান পরিত্যাগ করা আমাদের সাধ্যাতীত! মা ক্ষমা করুন। অন্যস্থানে যাইতে আমাদিগকে অনুমতি করিবেন না।

এবার সেই ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকামিণী গিরিরাজ তনয়া বড়ই বিষণ্ণ হইলেন। তিনি একে একে সকলকেই উক্ত ঘোষের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কেহই যাইতে সম্মত হইল না। শেষে অনেক চিন্তার পর সর্পকে বলিলেন—"দেখ বাপু সর্প! কেহই তারিণী ঘোষের বাড়া যেতে চায় না; এখন যে কি উপায় করিব তাইত ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছি না, একজন এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে না গেলে আমার ভক্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কারিণী নামে অপযশ ঘোষিবে। তাই বলি সর্প তুমই যাও।"

এই কথা শুনিবামাত্র সর্পটী তড়াক্ করে একলাফে গললগ্ন কৃতবাসে, জোর হাতে মহামায়ার সম্মুখে আসিয়া বলিল—"মা, এতক্ষণের পর আপনি ঠিক অজ্ঞা করেছেন। আপনার ভক্ত ঘোষের বাড়ী, আমি ভিন্ন আর কাহারও যাওয়া শোভা পায় না।

আমি মা। বায়ুভুক্। বনে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, পর্ব্বতে, ও গিরি কন্দরে কত যুগ যুগান্তর শুধু বায়ু ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করিতে পারি। তা মা! সপ্তমী অষ্টমী এবং নবমী এই তিনটি দিন কি আর আমি অনাহারে থাকতে পারব না? তা আমি বেশ থাকতে পারব, আপনার আর কোন চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই।

আপনি নিঃশঙ্ক চিত্তে পিত্রালয়ে যান। আমি এই তিন দিন আপনার সেই ভক্ত ঘোষের পূজার দালানে গিয়ে ফনাটী তুলে ছাঁকা বায়ু ভক্ষণ করিব, আর দুলিতে থাকিব।"

ভগবতী। তা বেশ বাপু! তুমিই যাও, নহিলে আমাকে বড়ই অপ্রতিভ হইতে হইবে। কি জানি বাপু! সকল ব্যক্তি সমান হয় না, তা যাই হোক আমার কাছে কিন্তু সকল ভক্তই সমান। এক্ষণে খাবার উদ্যোগ কর।

সর্প। আজ্ঞা হাঁ মা! আমি এখনই যাচ্চি। তবে এই কয়েকদিনের মত পেট পুরে আহার করে নিই, তাহারপর যাত্রা করিব। আপনি সেজন্য কিছুই ভাবিত হইবেন না।

এই বলিয়া সর্প উদর পূর্ণ আহার করে। শ্রীমান্—ঘোষের বাড়ী যাত্রা করিল।"

পাঁচু এইরূপে আপনার উপাখ্যান শেষ করিয়া দালানস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"বলি মহাশয়গণ! শুনলেন ত? পাঁচু গাঁজা খায় বটে, তা বলে সে এত বেতালা নয় যে, দুর্গাপূজার দালানে এসে মনসার প্রণাম মন্ত্র আওড়ায়। আমি এখনই কৈলাসপুরী হইতে সঠিক পাকা খবরটী জেনে এলাম যে, এবার আর এখানে মা আসিতেছেন না, তিনি তাঁহার পার্শ্চর

সর্পটীকে এ যাত্রা পাঠিয়ে দিয়েছেন। কি জানেন মহাশয়গণ! পূজার কদিন এবাড়ীতে যাওয়া আসা করিতে হয়। সাপটীকে মা দুর্গাই পাঠাল, আর কৈলাসপুরী হইতেই আসুক, সাপের জাত ত বটে, তাকে আর বিশ্বাস কি বলুন। কি জানি যদি পেটের জ্বালায় একটা ছোবল মারে; তাই আগে হতে মনসার প্রণামটা পড়ে "আপ্তসার" করে রাখলাম! এখন বোধ হয়, আব আমাকে গেঁজেল বলে উপহাস করিবেন না।"

এই কথাগুলি বলার পর পাঁচু কলিমাময় অধরে একটুকু হাসির দেখা দিল।

ঘোষজ মহাশয় ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন, মুখে একটীও কথা সরিল না। কথা কাণে হাঁটে, সুতরাং অল্পক্ষণ মধ্যে পাঁচুর গল্পটা সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। আমাদের গল্পও ফুরাইল।

গল্প ফুরাইল বটে, কিন্তু আজও ঘোষজা মহাশয়কে দেখিলেই পাড়াব বালক বৃন্দ বলিয়া উঠে,—

আস্তিকস্য মুর্নেম্মাতা ভগিনা বাসুকে স্তথা।
জরৎ কারু মুনেঃপত্মা মনসাদেবী নমোইস্ততে॥

শ্রী সঃ—

(১২৯৯ সন; আশ্বিন সংখ্যার জন্মভূমি হইতে সংগৃহীত।)

একশত বৎসর পূর্ব্বে দুর্গোৎসবের খরচ

একশত বৎসর পূর্ব্বে দুর্গোৎসবে কিরূপে খরচ হইত তাহার একটি অবিকল নকল নীচে দেওয়া হইল। পাঠক ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন, বর্ত্তমানে জিনিস পত্রের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা কতগুণ বাড়িয়াছে এবং কেনই বা পূর্ব্বের ন্যায় ধুমধামের সহিত দুর্গোৎসব করা অধিকাংশ বাঙালীর পক্ষে বর্ত্তমানে অসম্ভব হইয়াছে। বর্ত্তমানে দুর্গাপূজা অনেক হয়, কিন্তু প্রকৃত দুর্গোৎসব অতি অল্পই হয়। মায়ের পূজার তিন দিন অকাতরে অন্নদান বস্ত্রদান ইত্যাদি যাহা দুর্গোৎসবের প্রধান অঙ্গ, তাহা কয়জনের পক্ষে বর্ত্তমানে সম্ভব?

ইহা কলিকাতা ১৯ নং নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীটের ৺রাজকৃষ্ণ মিত্রের বাড়ীর খরচ। তাঁহারই বংশধর শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় তাঁহাদের সেরেস্তার পুরাতন খাতা হইতে ইহা আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। এই হিসাব দেখিবার সময় পাঠক মনে রাখিবেন, ইহা কলিকাতার দর এবং 'লগনসা'র সময়ের দর।

সন ১২৩০ সাল। আশ্বিন। দুর্গাপূজার খরচ—

	টাকা,	আনা,	পয়সা
কাটাম—তক্তা ১ খানা, বাঁশ, দড়ি,			
পেরেক, মাটি, দিঃ মোট চুক্তি—	৫৲		
কুমারদিগের একমেটের খোরাকী—	২৲	৮	১পঃ
দোমেটের খোরাকী—	১৲	১৩	১পঃ
আচার্য্যদিগের খোরাকী—	১৲	৬	
„ দক্ষিণা—	৪৲		
„ সিদা—		৬	
ঠাকুরের গায়ে বসাবার কাপড়—			
সারে দশ হাত—		১৪	
সারে ছয় হাত—		৯	২পঃ
রং করা মোট চুক্তি—	৪৲	৮	
ঠাকুর গড়া মোট চুক্তি—	২৫৲		
সাজ দক্ষিণা—	৭১৲		
কাপর-গঞ্জী ৮ খান—	৭৲	১২	
লালপেড়ে ধুতি ১০ জোড়া—	৯৲	১	
সাদা জোড় ৬টী—	২৲	১৪	২পঃ
গামছা ৪ খানা—	১৲	১২	
কার্ত্তিক গণেশের শান্তিপুরের জোড় ২টী—	৩৲		
চেলীর সাড়ী ৮ খানা—	১৯৲	৮	
বরণের জোড় তসর ৩টী—	১৫৲		
কাপড় ২৭ জোড়া—	৭৪৲	১	২পঃ

	টাকা,	আনা,	পয়সা
শান্তিপুরের ২ জোড়া—	৩৲		
সাড়ি ২৪ খানা—	৩৯৲	৩	২পঃ
*ভুনি ১৬ খানা—	২৮৲	৩	১পঃ
ঢাকাই ধুতি ১০ খানা—	৫৯৲		
চাউল কামিনী আতপ ২০/মণ			
২·৫০ পঃ হিঃ	৫০৲		
মুগী চাউল ৯/মণ ২৲ হিঃ	১৮৲		
দাদখানি ১ মণ দশ সের ৩৲ হিঃ	৩৲		
কালীকলাই ১২ সের	১৲	৩	২পঃ
সোনামুগ ডেড় মণ	৪৲	২	১পঃ
পাট নাই বুট ১৫ সের		১০	২পঃ
লাট বুট ১৫ সের		১২	
অরহর ডাল ১/মণ	৩৲	৩	
সাদা বুট ১৫ সের		১৩	১পঃ
খ্যাসারি আধমন		১৫	
বড়বটী ১০ সের	১৲	৮	
হারীমুগ আধ মণ	১৲	৬	
লবণ ৩০ সের	৩৲	৬	
গুড় ৪ মণ আড়াই সের	১৭৲	১২	
ধান্য ৫ মণ	৬৲	১৪	

* বিধবাদের উপযুক্ত শাদা থান (যাহাতে শাদা পাড়ও থাকিবে না,) তাহাকে ভুনি বলিত।

	টাকা,	আনা,	পয়সা
মিছরা	২৲	৮	২
সর্ব্বপ্রকার ঝাল মশলা ও গরম মশলার মোট খরচ—	৬৲	২	১
মোমবাতি ১২৯টা ওজন আধমণ ৭৯৲ হিঃ	৩৯৲	৮	
দধি ২ মণ ৮ সের ৩৲ হিঃ	৬৲	৯	৩
দুধ ১ মন ২৫ সের ৪৲ হিঃ	৬৲	৮	
খাসা সন্দেশ ৩ মণ ৪ সের ছয় ছটাক্ ১৫৲ হি:	৪৬৲	১৩	১
রসকরা সারে ২১ সের ৯৲ হি:	৪৲	১৩	১
চিনি তিন পুয়া		২	৩
ময়দা ২ মণ ২২ সের সারে ৭ টাকা মণ হিঃ	১১৲	৭	৩
ব্যসম ১৫ সের ৫৲ হিঃ	১৲	১৪	১
সুটী ১৫ সের ৫৲ হিঃ	১৲	১৪	১
ঘৃত ১ মণ ৩০ সের ৬ ছটাক্ মণ সারে ২৮ হিঃ	৫৪৲	১৪	২
পাঁঠা ৬টা	৯৲	৩	২
বলিদানের দক্ষিণা	২৲		
সিধে		৬	
আতর ২ তোলা	২৲		
গোলাপ জল আড়াই সের	১৲	১৪	
নারিকেল তৈল ১ মণ ১৫৲ হিঃ	১৫৲		

	টাকা.	আনা,	পয়সা
সরিষার তৈল ১ মণ সাড়ে ২৫ সের			
সাড়ে ৪৲ হিঃ	৮৲	৮	১
জ্বালানি কাঠ ৪৯ মণ	১৮৲	২	১
গাড়ু (জল রাখা) ২ সের ৫ ছটাক			
১ টাকা ২ আনা হিঃ	২৲	৯	
বাটা (পানের) ১ সের সাড়ে ৮ ছটাক			
ডেড় টাকা হিঃ	১৲	১১	৩
পিতলের বাটী ১ সের সাড়ে ৯ ছটাক		১০	৩
কাঁসার বাটী ১ সের সাড়ে ৩ ছটাক			
২৲ হিঃ	২৲	৭	
গেলাস ১৩টা ১২ আনা হিঃ।	৯৲	১২	
দক্ষিণা	৪৲		
চণ্ডীপাঠ	৪৲		
দুর্গানাম	৩৲		
বরণ দক্ষিণা	২৲		
হোমের দক্ষিণা		৪	
কুমারী ভোজনের সাড়ী ৩ খানা	১৲	১২	
তাষাওয়ালা (বাদ্য বিশেষ)	৫৲		
ঢুলি ২ জন	৫৲		
যাত্রাওয়ালা (৩ রাত্রি)	১০২৲		
পেলা	৩০৲		
খেরো ৪ হাত		৮	

	টাকা,	আনা,	পয়সা
গোটা ২০ হাত	১৪৲		
নিরঞ্জনের বেহারা	১৫৲	৮	
তামাক ২৪ সের ৩ পুয়া, ৬ টাকা ৮ আনা হিঃ	৩৲	১৩	
অম্বরী তামাক ৪ সের ২ ছটাক টাকায় ৩ সের হিসাবে	১৲	৬	
মৎস্য ১ মণ ২৬ সের ১৩৲ হিঃ	২০৲	৭	

* ১৬০ বৎসর পূর্ব্বে যে কড়া, গণ্ডা, বুড়ি এবং আনা'র যে অক্ষরগুলি প্রচলিত ছিল বর্তমান মুদ্রণে সেই অক্ষরগুলি প্রচলিত না থাকায় এখানে সংখ্যার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

* ১৬০ বৎসর পুর্ব্বে ১ আনা ছিল ৪ পয়সায়। ১৬ পয়সায় ছিল ৪ আনা। ৩২ পয়সায় ছিল ৮ আনা। ৪৮ পয়সায় ছিল ১২ আনা এবং ৬৪ পয়সার মূল্য ছিল ১ টাকা।

একশত ষাট বৎসর পূর্ব্বে দুর্গাপূজার যে হিসাব এখানে দিলাম তা ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল "একশত বৎসর পূর্ব্বে দুর্গোৎসবের খরচ" শিরোনামে। বর্ত্তমানে একশত'র জায়গায় আরও ষাট বৎসর যোগ হয়েছে। আশাকরি হিসাব দেখে কারও বুঝতে অসুবিধা হবে না, যদি কারও কোন অসুবিধা হয় তবে বয়স্কদের জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবেন, তার কারণ এর মধ্যে অতীতের কড়া, গণ্ডা, বুড়ি সব আছে, এখানে লিখে সব বুঝাতে গেলে ভূমিকাটুকু আরও অনেক বড় হবে। এখানে কয়লার উল্লেখ নেই কারণ

তখনও আমাদের দেশে কয়লার প্রচলন হয়নি তাই কাঠের উল্লেখ আছে ৪৯ মণ। আরও একটা বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করছি যে এখানে বিড়ি বা সিগারেটের কোন উল্লেখ নেই কিন্তু তামাকের উল্লেখ আছে ২৪ সের ৩ পোয়া এবং আরও ভাল তামাক যেটা তা আছে ৪ সের ২ ছটাক।

এই হিসাব হইতে বোঝা যায় যে ১ শত ৬০ বৎসর পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত জমিদার বাড়ীতে দুর্গোৎসব বেশ ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল ৯৫০, টাকার মধ্যে। এই ফর্দ অনুযায়ী বর্ত্তমানে দুর্গোৎসব করিতে গেলে কত খরচ পরিবে তা পাঠক-পাঠিকারা ঠিক করুন।

সঙ্কলক—

শ্রী রতন কুমার দাস।

দুর্গাপূজা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ধর্ম্মহেতু কর্ম্মযোগে পৌত্তলিক পূজা
নির্ম্মাণ করহ সুখে দেবী দশভুজা॥
প্রথমতঃ মৃত্তিকায় প্রতিমা করিয়া।
অর্চ্চনা করহ যাঁরে ঈশ্বর স্মরিয়া॥
অন্তরে অচলাভক্তি করিয়া ধারণ।
ধূপ দীপ দেহ যাঁরে মুক্তির কারণ॥

নিজমতে শাস্ত্রমত করিয়া খণ্ডন।
তাঁর কাছে কর কেন ম্লেচ্ছ নিমন্ত্রণ ॥
পূজাস্থলে বিপরীত আয়োজন নানা।
মন্দিরের মধ্যভাগে কেন দেহ খানা ॥
ধর্ম্মমতে পাপকর্ম্ম মনেতে জানিয়া।
মিছে জাঁক কেন কর সাহেব আনিয়া ॥
হায় হায় মিছে খেদ মর্ম্ম হয়ে ভেদ।
হিন্দু মতে পূজা করি নষ্ট কর বেদ ॥
পূজাস্থলে কালীকৃষ্ণ শিবকৃষ্ণ যথা।
ঈশুকৃষ্ণ নিবেদিত মদ্য কেন তথা ॥
রাখ মতি রাধাকান্ত রাধাকান্ত পদে।
দেবীপূজা করি কেন টাকা ছাড় মদে ॥
বিকট প্রকট ভঙ্গি ধর্ম্ম সব গায়ে।
দেবীর সমীপে আছ জুতা দিয়া পায়ে ॥
ভবানী ভাবিয়া যাঁর ভাবনা প্রকট।
ভাঁড়ে মা ভবানী কেন তাঁহার নিকট ॥
ভবানী কোথায় আছ ধর্ম্মসভা নিয়া।
তোমার সাক্ষাতে হয় এই সব দিয়া ॥
পূজা করি মনে মনে ভাব এই ভাবে।
সাহেবে খাইলে মনমুক্তি পদ পাবে ॥
যতনে প্রণয়ে আন আপনার পুরী।
সেনয় প্রণয় শুধু প্রণয়ের ছুরি ॥

যতক্ষণ বর্ত্তমান মর্ত্তমান খেয়ে।
ততক্ষণ যাকে বটে প্রেমগুণ গেয়ে॥
মুখমুছে যায় শেষ বিদায় হইয়া!
ফুলিস ফুলিস ড্যাম্ নিগার বলিয়া॥
অতএব নৃপগণ এই নিবেদন।
পূজায় ক'রো না আর ম্লেচ্ছ নিমন্ত্রণ।

* * * *

চিন্ময়ী মূর্তিধ্যান—মাতৃধ্যান

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। বেলা নটা হইবে, ছোট খাটটিতে বিশ্রাম করিতেছেন, মেজেতে মণি বসিয়া আছেন। তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

আজ বিজয়া রবিবার ২২শে অক্টোবর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ আশ্বিন শুক্লাদশমী তিথি। আজকাল রাখাল ঠাকুরের কাছে আছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ মাঝে মাঝে যাতায়াত করেন। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল ও হাজরা মহাশয় বাস করিতেছেন। রাম, মনোমোহন, সুরেশ, মাষ্টার, বলরাম ইহাঁরাও প্রায় প্রতি সপ্তাহে—ঠাকুর দর্শন করিয়া যান। বাবুরাম সবে দু'একবার দর্শন করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ:—তোমার পূজার ছুটী হয়েছে?

মণি :—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী পূজার দিনে কেশব সেনের বাড়িতে প্রত্যহ গিছলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ :—বল কি গো!

মণি :—দুর্গাপূজার বেশ ব্যাখ্যা শুনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ :—কি বল দেখি।

মণি :—কেশব সেনের বাড়ীতে রোজ সকালে উপাসনা হয়,—দশটা এগারোটা পর্যন্ত। সেই উপসনার সময় তিনি দুর্গাপূজার ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বল্লেন, যদি মাকে পাওয়া যায়—যদি মা দুর্গাকে কেউ হৃদয় মন্দিরে আনতে পারে—তাহলে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ আপনি আসেন। লক্ষ্মী অর্থাৎ ঐশ্বর্য. সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞান, কার্ত্তিক অর্থাৎ বিক্রম, গণেশ অর্থাৎ সিদ্ধি, এ সব আপনি হয়ে যায়—মা যদি আসেন।

শ্রীম কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত হইতে
সংকলিত